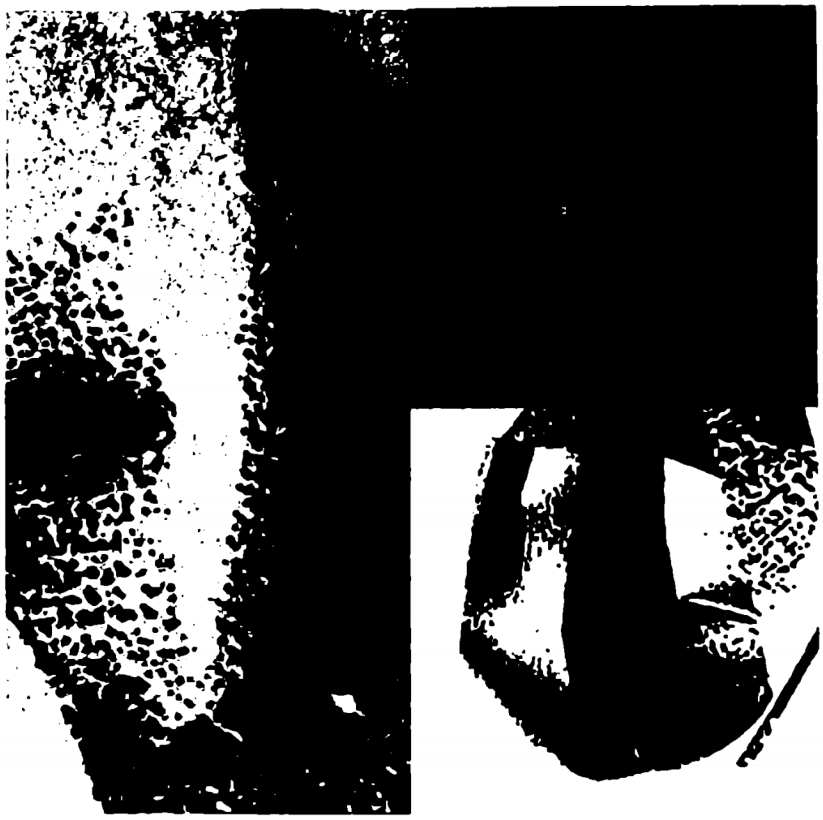

পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরান

উৎসর্গ

নাজিমুদ্দীন মোস্তান সাংবাদিক
ড. আহমেদ কামাল ঐতিহাসিক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ॥ প্রকাশক : সন্দেশ, ঢাকা

উনিশশো তিরানব্বই সালের আগস্ট মাসে এই চারতলার চিলেকোঠামতো ঘরটিতে আমি থাকতে আসি। আমার লোকেরা বলল, চারতলায় একটা ঘর পাওয়া গেছে, আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন, পছন্দ হয় কি না। আমি বললাম যাওয়াযাওয়িতে কাজ নেই, যখন পাওয়া গেছে, একেবারে ঠিক করে ফেলো। তারা ভাড়া ঠিক করল, রীতিমতো দরদস্তুর করে আগাম ছমাসের জায়গায় তিন মাসে নামিয়ে আনল। যখন চুক্তি করার কথা উঠল, বাড়িঅলা ভদ্রলোক বেঁকে গেলেন। তিনি জেদ ধরে বসলেন, যে লোক বাড়িতে থাকবে, তার সঙ্গে বাতচিত না করে তিনি তাঁর বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি নন। আমার লোকেরা এসে জানাল, এই তো মোটে চার বাড়ি পর, আপনি একটু গিয়ে ফাইনাল কথা বলে আসুন।

আমি সাফ বলে দিলাম, আমার যদি বাড়ি দেখে অপছন্দ হয়, কিংবা বাড়িঅলার সঙ্গে কথায় না বনে, তা হলে ঘর নেয়া হবে না। তোমরাও যেমন চাইছ আমি এ বাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই, সেটি সম্ভব হচ্ছে না। তারচে এক কাজ করো, তোমরা গিয়ে বাড়িঅলা ভদ্রলোককে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে এসো। এখানেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে। আমার আশঙ্কা ছিল হবু ভাড়াটের আবদার মেটাতে বাড়ির মালিক ভদ্রলোক আমার বর্তমান আস্তানার চৌকাঠ মাড়াতে রাজি হবেন না।

শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হল। আমার লোকেরা এসে জানাল, আগামীকাল সকালবেলা আমার ভাবী বাড়িঅলা সাহেব মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন। ফজরের নামাজ সেরে বাড়িতে এসে নাশতা খাবেন। নাশতা খাওয়ার পর তিনি একটু হাঁটতে বেরুবেন। এই প্রাতর্ভ্রমণ সেরে আসার পথে থেমে তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসবেন। বাড়িঅলা সাহেব আমার লোকজনদের তাঁর সকালবেলার সময়সূচিটা যেভাবে জানিয়েছিলেন, তারা হুবহু দাঁড়ি-কমা মিলিয়ে সবটা আমার কাছে বলেছিল। আমি কথাবার্তার ধরন দেখে বুঝে নিয়েছিলাম বাড়িঅলা সাহেবটি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ধরনের মানুষ হবেন।

আগামীকাল ভাবী বাড়িঅলা দর্শন দিতে আসছেন, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করার পর তার আগের রাতে আমার কাজ বেড়ে গেল। ভালো করে ঝেঁটিয়ে সপ্তাহ ধরে জমে থাকা ধুলোবালি পরিষ্কার করতে হল। লম্বা ঝাড়ু দিয়ে দেয়ালের ঝুলকালি অপসারণ করে নিলাম। বইগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে শেলফে রাখলাম। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রাখা ময়লা জামাকাপড় সব উঠিয়ে নিয়ে লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দিলাম। বাকি কাপড়চোপড় যা আছে গোছগাছ করে আলনায় রাখলাম। পুরোনো চাদরটা উঠিয়ে নিয়ে বিছানায় একটি নতুন চাদর পেতে দিলাম। বালিশের ওয়াড়গুলো বদলাতেও ভুল করলাম না।

অস্বস্তিতে সারারাত আমার ভালো করে ঘুম হয়নি। আগামীকাল সকালবেলা হবু বাড়িঅলা নতুন ভাড়াটের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসছেন। আমার বর্তমান নিবাসের হালচাল দেখে তাঁর যদি অপছন্দ হয়, তিনি আমার কাছে বাড়ি ভাড়া দেবেন না। খুব সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভালো করে দাড়িটা কেটে নিলাম এবং গোসল সেরে ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবি পরলাম। যেহেতু শুনেছি বাড়িঅলা একজন নামাজি বান্দা, সকালবেলা অনেকটা পথ হেঁটে নামাজ আদায় করেন, আমি গতবছর রোজার ঈদে কেনা কিস্তিটা বের করে আনলাম এবং দুভাঁজের মাঝখানে ফুঁ দিয়ে একটুখানি ফুলিয়ে টেবিলের ওপর রাখলাম। ধরে নিয়েছিলাম, টেবিলের ওপর দাঁড় করানো টুপিটি দেখামাত্রই বাড়িঅলা সাহেবের মনে ধারণা জন্মাবে ধর্মেকর্মে আমার বিলক্ষণ মতি আছে এবং তাঁর মনে আমার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা হবে। আর তিনি তাঁর চারতলার চিলেকোঠার আড়াই কামরার ঘরটি আমার কাছে ভাড়া দিতে অমত করবেন না।

নাশতা খাওয়ার পর থেকে উৎকণ্ঠাসহকারে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে আমার হবু বাড়িঅলা সাহেব দর্শন দিলেন। আমি উঠে গিয়ে তাজিমসহকারে তাঁকে হাত ধরে চেয়ারে বসালাম। বাড়িঅলা সাহেব চেয়ারে বসেই আমার ঘরের সবকিছু আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে দেখলেন। আমার মনে হল কড়া পাওয়ারের চশমার ভেতর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আমার ঘরের কোনাকানচি সবটা জরিপ করছে। আমি একটুখানি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। গতরাতের ঝাড়ামোছা, সাজানো গোছানো একবারে বিফলে যায়নি।

আমার হবু বাড়িঅলা ভদ্রলোকটি দেখতে একেবারে লকলকে চিকন। রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ যদি বেশি বাতাস ধাক্কা দেয় অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে যাবে এমন শরীর। গায়ে খয়েরি রঙের একটা পাঞ্জাবি। মাথায় কিস্তিটুপি। মুখে পান, কিন্তু চিবিয়ে যাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে। খুব ভালো করে ঠাহর না করলে চোখে পড়ে না। তিনি খুব নরম জবানে কথা বলেন। জানতে চাইলেন আমি কত টাকা মাইনে পাই। তাঁর মাসিক ভাড়া মারা যাবে না, এরকম একটি আস্থা সৃষ্টি করার জন্য মাসে যত পাই পরিমাণটা তার তিনগুণ বাড়িয়ে বললাম। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, বাড়িতে আপনারা কতজন থাকবেন? জবাব দিলাম আমি, একজন ভায়ের ব্যাটা এবং আরেকটি ছেলে, আপাতত এই তিনজনই থাকব। বাড়িঅলা সাহেব জানালেন তিনজনের বেশি যদি হয়, তিনি ভাড়া দেবেন না।

এই সময়ে যে বাড়িতে থাকছি সে বাড়ির বাড়িঅলি আপা এসে হাজির হলেন। এক মহল্লার মানুষ। বাড়িঅলার সঙ্গে তাঁর বিলকুল চেনাজানা। তিনি বললেন, আপনি তিনজনের বেশি থাকতে পারবে না একথা এত জোরের সঙ্গে বলছেন কেন? আগের

যিনি ভাড়া থাকতেন, তাঁর তো পাঁচ সাত জনের একটা পরিবার ছিল। ছাদের ওপর কাপড় মেলে দিতে গিয়ে আমি প্রতিদিন সবাইকে দেখেছি। বাড়িঅলা সাহেব বাড়িঅলি আপার কথার জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলেন না। আমাকেই জিগগেস করে বসলেন, আপনার বেগম কোথায়? আমি বললাম, আমার তো কোনো বেগম নেই। তিনি চুকচুক করে আফসোস করলেন। পান-মুখে আওয়াজটা ঠিকমতো বের হচ্ছিল না তাই বাইরে গিয়ে পিকটা ফেলে এলেন। মারা গেছে, না? কতদিন হয়? আমি বললাম, মারা যাবে কোত্থেকে? একেবারে বিয়েই করিনি সাহেব।

আমার কথা শুনে বাড়িঅলা সাহেব চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, ব্যাচেলর মানুষের কাছে বাড়ি ভাড়া দেয়ার তো কোনো নিয়ম নেই। আমি বললাম, নিয়মের কথা আসবে কেন, আপনি ভাড়া দিলে আমি থাকতে আসব, না দিলে থাকব না। তিনি খানিক চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, বুঝলেন তো ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি, হঠাৎ করে একজন ব্যাচেলর ঢোকালে ন্যায় অন্যায় কিছু একটা যদি ঘটে যায়। তা ছাড়া পাড়াপড়শি আছে। কেউ যদি কিছু বলে ফেলে। মুশকিল। আমার যখন বউ নেই, একথা উঠবে আমি জানতাম। তাই বলে দিলাম, আমার কথা তো আমি বলে ফেলেছি, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, ঘরটা আমাকে দিতে পারেন।

বাড়িঅলা সাহেব বললেন, একজন ব্যাচেলরকে বাড়ি ভাড়া দেয়া, জিনিসটি সহজ নয়, আমার বেগম এবং ছেলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। বর্তমান বাড়ির বাড়িঅলি আপা বললেন, আর পরামর্শ করবেন কী? ভাড়া দিয়ে দেন। উনার মতো নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে আপনি পাবেন কোথায়? আমাদের এই বাড়িতে তিন বছর ধরে থাকছেন, পাড়া-পড়শি কেউ কি কিছু বলতে পেরেছে? বর্তমানে বাড়িঅলি আপার কথায় হবু বাড়িঅলা সাহেব নিমরাজি ধরনের হলেন। তার পরেও বললেন, তবু...। বাড়িঅলি আপা বললেন, তবু আবার কী, চোখ বুজে ভাড়া দিয়ে দেন। বাড়িঅলা সাহেবের বাড়িটা ভাড়াটেস্থ করার বোধ হয় খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তিনি এবার ইংরেজিতেই বললেন, বিফোর য়্যু টেক দ্যা পজেশন, টার্মস কণ্ডিশনস এভরিথিং মাস্ট বি মেনশনড ইন দ্যা এগ্রিমেন্ট। বাড়িঅলা সাহেবের মুখে ইংরেজি শুনে আমি জানতে চাইলাম, তিনি আগে কোথায় কাজ করতেন। ভদ্রলোক জানালেন, তিনি মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন থেকে সেকশন অফিসার হিসেবে রিটায়ার করেছেন আজ পাঁচ বছর।

ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়িভাড়ার এগ্রিমেন্ট হয়ে গেল। তিন মাসের ভাড়াও আগাম বুঝিয়ে দিলাম। আমার লোকেরা বলল, সব তো হয়ে গেল, এবার আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন। আমি পূর্বের অবস্থান থেকে একবিন্দুও নড়লাম না। আমি বললাম, তোমাদের জানিয়েছি, দেখে যদি পছন্দ না করি, ও বাড়িতে আমি যাব না। চুক্তি হয়েছে তাতে কী? তোমরা আমার জিনিসপত্তর সব তুলে দাও। আমার লোকেরা সারাদিন ধরে কষ্ট করে চারতলায় খাট ওঠাল, টেবিল ওঠাল। বিছানাপত্র বাসনকোসন, ফ্রিজ ও আলনা মায় বদনাটি পর্যন্ত চারতলায় তুলে দিয়ে জানাল, বেতের বড় খাটটি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানো যাচ্ছে না। আমি বললাম, সেসবের আমি কিছু বুঝিনে। তোমরা একটা উপায় বের করো। আমার লোকদের একজন বাজারে গিয়ে একটা লম্বা দড়ি কিনে নিয়ে এল।

তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে অনেক কায়দা-কানুন করে ওপর থেকে টেনে টেনে চারতলার বারান্দায় খাট ওঠানো হল। তাদের পছন্দমতো ঘরের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে এসে আমাকে বলল, সব রেডি, এবার আপনি যেতে পারেন। তারা আমার হাতে চারতলার ঘরের চাবিটি তুলে দিল এবং একজন আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রইল। আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল। এই ঘরটাতে আমি তিন বছর ধরে থাকছি। আমার মনে হল, সকলে মিলে আমাকে বধ্যভূমিতে পাঠাচ্ছে। পুরোনো বাড়ির আঙিনায় একটি আপেল এবং আঙুর চারা অনেক দূর থেকে, অনেক কষ্ট করে এনে লাগিয়েছি। সেই চারা দুটো এতদিনে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে। বেলির ঝাড়ে শাদা শাদা কলিগুলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। সন্ধেমালতির ঝাড়টি এই সবে লাগিয়েছি। আধারাতে ঘুম ভেঙে গেলে চুপিচুপি মাটি ছাড়িয়ে ওঠা দ্রাক্ষালতাটিকে আদর করতাম। আপেলতরুটির কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলতাম। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এই তরুশিশুগুলো আমার আদরের ভাষা বুঝতে পারে। এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি, ওদের দেখবে কে? আহা আমার আঙুরবালা, আপেল কুমার, কে তোমাদের যত্ন করবে। আমার মনটা হুহু করছিল। শেষবারের মতো তরুশিশুদের গোড়ায় পানি দিলাম।

আমাকে সকলে বলল, সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে রাখা হয়েছে, এবার আপনি গিয়ে ইচ্ছে করলে ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। আমি ভালো প্যান্ট এবং সুন্দর জামাটা পরলাম। অনেক দূরের দেশে কোথাও চলে যাচ্ছি এরকম একটা ভাব করে ছাতাটি হাতে নিয়ে পুরোনো নিবাস থেকে বেরিয়ে চার বাড়ি পর চারতলায় ঘরটিতে উঠে এলাম। ঘর দেখে পাছে মন খারাপ হয়, সেজন্য স্থির করলাম, এইরাতে কোনোকিছুই দেখব না। কেননা পুরোনো বাড়িতে মনটা এখনো পড়ে রয়েছে। স্যান্ডেল জোড়া ছেড়ে খাটে উপুড় হয়ে একটা উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করলাম। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলাম এখনো পুরোনো বাড়িতেই রয়ে গেছি। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে গেছি টের পাইনি।

নতুন বাড়িতে যখন সকালে ঘুম ভাঙল মনে হল আমি একটা নতুন দেশে এসে গেছি। কামরাগুলো ঘুরেফিরে দেখলাম। মনটা আপনা থেকে খুশি হয়ে উঠল। গোটা বাড়িটারই একটা খেলনা খেলনা চেহারা আছে। রুমগুলো জাহাজের কেবিনের মতো। শুধু বাথরুমটা দেখে মনটা হোঁচট খেয়ে গেল। কিন্তু দরোজা খুলে যখন বাইরে তাকালাম, সামনে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একফালি ছাদের দেখা পেলাম। এই ছাদটাকেই আমি ভালোবেসে ফেললাম। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে যখন ঢাকা শহরটাকে দেখলাম, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আকাশটা চারপাশে গোল হয়ে নেমে এসেছে। চারপাশে সবুজ সবুজ গাছপালা আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। কী সুন্দর আমার শহর। পুবদিকে, উত্তরদিকে এবং দক্ষিণদিকে যেসকল গম্ভীর গম্ভীর দালান আকাশ আড়াল করার সংকল্প নিয়ে মাথা তুলছে, এই ছাদ থেকে দেখলে তাদের মায়ামাখানো এবং অপরূপ দেখায়। এতক্ষণে পুরোনো নিবাসের সঙ্গে নতুন ডেরার একটা তুলনা করার সুযোগ পাওয়া গেল। গোটা আড়াই বছর ধরে চার বাড়ি পরে, তিনতলা দালানের নিচতলার একটি ঘরে কাটিয়েছি। মনে হল এতদিন আমি মায়ের পেটের ভেতর

কাটিয়ে এসেছি। অদ্য সকালবেলা পৃথিবীর বুকে নতুন করে যেন ভূমিষ্ঠ হলাম। বাড়ি-বদলের ব্যাপারটি আমার কাছে নতুন জন্মের আমেজ নিয়ে দেখা দিল। নতুন জন্ম না বলে কী বলব। প্রসারিত আকাশ, অট্টালিকার সারি, গাছপালা, অজস্র পাখপাখালির ওড়াউড়ি সবকিছুর সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের একটা সংযোগ এই যে আবিষ্কার করলাম, সামনে পেছনে যা দেখছি সবকিছু আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, চলমান সত্তাসমূহের সঙ্গে আমিও রয়েছি, সকলে যেমন দাঁড়িয়ে আছে, আমিও তেমনি দাঁড়িয়ে আছি, সকলে যেমন চলছে, আমিও চলছি, সকলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার উপলব্ধি—এটাই তো নতুন জন্ম। 'নতুন জন্ম', 'নতুন জন্ম' শব্দ দুটি আমার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। হতে থাকল।

আমার ছাদটি ঘেঁষে একটি নারকোল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। চিরল চিরল পাতাগুলো বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপছে। একটা শাখা আমার ছাদ ছুঁয়েছে। গাছে হলুদ ফুল এসেছে। হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবেই দেখা যায়। নারকোল গাছটির পাশে আরেকটি নারকোল গাছ। সেটির মাথা বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে। শুধু কাণ্ডটি দেখা যায়। আমার দক্ষিণের জানালা বরাবর একটি আমগাছ। গাছটি যথেষ্ট উঁচু নয়। শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব মিলিয়ে গাছটির নিজস্ব একটি সংসার রয়েছে। এই গাছের নিবিড় পাতার আড়ালে কাকেরা রাত্রিযাপন করে। ভোরের অনেক আগে থেকে দোয়েলেরা শিস দিতে থাকে। একটু বেলা হলে এক ঝাঁক বুলবুলি কোত্থেকে উড়ে এসে ডালে ডালে ছুটোছুটি করে। আসে ঝুঁটিশালিক, গাঙশালিক। দুটো ঘুঘু গলা ফুলিয়ে যখন ডাকে, আমার গ্রামের ছাড়া ভিটির কথা মনে পড়ে যায়। এত পাখি দলে দলে, একা একা জোড় বেঁধে বেঁধে কোথা থেকে আসে? আমি কি জানি কোথায় পাখিদের দেশ? এক ঝাঁক সবুজ টিয়ে আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়ায়, তাদের কর্কশ আওয়াজ কানে এসে লাগে। বিশাল আকাশের প্রাণস্পন্দনের মতো তাদের ওড়াউড়ির শব্দ আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখে।

আমার বাড়ির পাশে রাস্তা। তার পাশে বাড়ি এবং বাড়ি, বাড়ির পরে বাড়ি। এই এত উঁচু থেকে বাড়িগুলোর অস্তিত্ব গাছপালার আড়ালে অনেকখানিই ঢাকা পড়ে থাকে। নিচ থেকে দেখলে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম চিত্র। বাড়িগুলোই আসল, গাছপালার চেহারা বিশেষ নজরে আসে না। আমার বাড়ির দুটি বাড়ি পরে একটি পাঁচতলা বাড়ি। ওপরের তলায় আজও সিমেন্টের পলেস্তরা লাগেনি। লাল লাল ইটগুলো দেখা যায়। সে বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে একটা নোনাফলের গাছ আকাশের দিকে উঠছে তো উঠছেই। ঢাকা শহরে এটি বিরল বৃক্ষ। খুব খাপছাড়া ব্যাপার। আমার মনে হয়, গাছটিও সেকথাগুলো ভালো করে বোঝে। নোনাগাছটি জানে এই ইট-কাঠের শহরে তার উপস্থিতি বড় বেমানান। তাই গ্রাম্য জেদের বশবর্তী হয়ে গাছটি ওপরের দিকে ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে স্পর্ধায় আকাশ স্পর্শ করার চেষ্টা করছে।

এই বারান্দার ছাদটিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি ঈশ্বরের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি। বর্তমানে আমি যেখানে আছি, তার অবস্থান পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র, ইতস্তত প্রসারিত পৃথিবীর বুকের আঁকাবাঁকা পথসমূহ থেকে অনেক দূরে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে বড় আজব জায়গা। এইখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবী দেখতে গেলে আমার

নিজের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আবার নিজেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর সঙ্গে মুলাকাত ঘটে।

বিকেলবেলা সুশীল এল আমার খবর নিতে। সে আমার পালক ছেলে। সুশীলের খুটিয়ে দেখার দৃষ্টি অসাধারণ। সে প্রতিটি জিনিসপত্র যাচাই করে দেখল। তার ধারণা আমি এ বাড়িতে আসার সময় অনবধানতাবশত কোনো-না-কোনো জিনিস ছেড়ে এসেছি। আপাতত কোনো ছেড়ে-আসা জিনিসের হদিস না পাওয়ায় সুশীল নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা কাজ বের করে নিল। রান্নাঘর থেকে শলার ঝাড়ুটা নিয়ে এসে বারান্দার ছাদটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। সুশীল সব কাজ এতটা মনোযোগের সঙ্গে করে, তার হাতে পড়লে অকাজটাও কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সে ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে এতসব নোংরা জিনিস বের করে আনল, দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পাতাপুতার সঙ্গে জবাই-করা মুরগির পালকসুদ্ধ আস্ত পাখনা, আধপচা একটি ইঁদুর, ভাঙা কাচের গুঁড়ো, বিকলাঙ্গ পুতুল, কী নেই তাতে। সুশীল সব দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা জিনিস একটা টুকরিতে ভরে নিয়ে বলল, ওগুলো নিচে ফেলে দিয়ে আসি। ফিরে এসে আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব। সুশীল নিচে গেল আর আমি সিগারেট জ্বালিয়ে মজার জিনিস দেখার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সুশীল ময়লা ফেলে ফিরে এলে আমি বললাম, কই সুশীল তোমার মজার জিনিস কোথায়। সে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, আগে সাবান দিয়ে হাত-পাগুলো একটু ধুয়ে নিই। অনেক নোংরা ময়লা ঘেঁটেছি। সে হাত-পা ধুয়ে গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, এইদিকে আসুন। আমাকে বারান্দার দক্ষিণদিকের ছাদে নিয়ে গেল। তারপর সুতোর মতো তিন, সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা একটি আধমরা চারা দেখিয়ে বলল, এটা কোন গাছের চারা বলুন দেখি। আমি বললাম, যে গাছের চারাই হোক না কেন, ওটা তো বাঁচবে না। তুলে ফেলে দাও। সুশীল বলল, তুলসী গাছের চারা, এটাকে মরতে দেয়া ঠিক হবে না। আমি বললাম, সুশীল তুমি তো খ্রিস্টান, তুলসী গাছ তোমার কোনো কাজে আসবে না। তুলে ফেলে দাও, দেখছ না শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। সুশীল বলল, তুলসী অনেক উপকারী গাছ, ওটাকে আমি বাঁচিয়ে তুলব। আমি তুলসী গাছ নিয়ে কী করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। একটি গল্প হয়তো লেখা যেত। আমি জন্মাবার অনেক আগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সে কাজটি করে ফেলেছেন। কিন্তু সুশীলকে বাধা দেব কী করে। যে কাজ সে একবার ধরে না করে ছাড়ে না।

আমি ভেবেছিলাম সুশীল আমাকে তুলসী দেখানোর পরে রেহাই দেবে। কিন্তু সে আবার আমাকে ডেকে ছাদের মাঝখানে পূর্বদিকের দেয়ালের গোড়ায় নিয়ে গেল। দুটো ইট পড়ে ছিল, সে দুটো সরিয়ে দিয়ে বলল এবার দেখুন। আমি দেখলাম তিনটি ক্ষুদ্র নয়নতারার চারা মরব মরব করছে। সুশীল বলল এগুলোকেও বাঁচিয়ে তুলব। আমি বললাম, যা ইচ্ছে করো। আমার মনে একটা ভাবনা জন্মাল, এমন সিমেন্টের শক্ত ছাদ ভেদ করে নয়নতারার চারা জন্মাল কেমন করে? আশ্চর্য প্রাণশক্তি!

তারপর সুশীল আমার কাছে আর কিছু জিগগেস করল না। তিনতলায় বাড়িঅলা সাহেবের বাড়ি থেকে চেয়ে একটা হাতুড়ি নিয়ে এল। লুঙ্গিটা একটু আলগা করে বসে হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙতে আরম্ভ করল। আমি বললাম ইট ভাঙছ কেন? সে বলল ইটের

গুঁড়ো দিয়ে নয়নতারা এবং তুলসীচারার চারপাশে আল বেঁধে দেব. যাতে করে পানি দিলে গড়িয়ে না যায়। সুশীলের আধমরা তরু শিশুটিকে বাঁচিয়ে তোলার সংকল্প দেখে আমি মনে মনে সাধুবাদ না দিয়ে পারলাম না। নিজেও তার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। ছাদের উত্তর-পশ্চিম দিকের কোনায় গাছের পাতা পচে পচে পলির মতো যে স্তরটি জমেছে, সেখান থেকে কোদাল দিয়ে কাদা চেঁছে চারাকটির গোড়ায় ঢেলে দিলাম। সুশীলকে বললাম, শুধু পানিতে কি গাছ বাঁচে, একটু তো মাটির দরকার। রান্নাঘর থেকে জমানো ফেলে দেয়া চা-পাতার টিনটা উপুড় করে নয়নতারা এবং তুলসী চারার গোড়ায় ছড়িয়ে দিলাম।

সুশীল নিয়ম করে দুবেলা সকাল বিকেল চারাগুলোর গোড়ায় পানি দিতে থাকল। ওমা, দুদিন না-যেতেই দেখলাম তুলসী এবং নয়নতারার চারাগুলো একযোগে পরামর্শ করে শোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। তাদের আধপোড়া পাতাগুলো উধাও। কাণ্ড ভেদ করে কচি সবুজ পাতা গজাতে আরম্ভ করল। দিনে দিনে তরুশিশুর শরীরের এমন সব পরিবর্তন ঘটে যেতে আরম্ভ করল, আমরা কেউ নীরব দর্শক থাকতে পারলাম না। তুলসী আর নয়নতারা প্রতিদিন নতুন করে আমাদের মনোযোগ কাড়তে আরম্ভ করল।

বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত যে-কেউ আসে, অপরূপ শ্যামলিমায় তুলসী এবং নয়নতারার চারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকল। তুলসী এবং নয়নতারার শিশু বাড়ার আনন্দে বাড়ছে। সুশীল যখন সকাল বিকেল পানি দিতে যায়, তার চোখের দৃষ্টিতে মুখের ভাবে প্রতিদিন আমি একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য লক্ষ করতে থাকি। চারাগুলো বেড়ে উঠছে, এই বেড়ে ওঠার অদ্ভুত আনন্দ সুশীলের শরীরে খেলে বেড়াতে থাকে। সে রাস্তাঘাটে যেখান থেকে পায় কাগজের ঠোঙায় করে শুকনো গোবর কুড়িয়ে এনে গুঁড়ো করে চারার গোড়ার চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। সুশীলের এই সংক্রামক আনন্দ একসময় আমাদেরও স্পর্শ করল। আমি এবং আমার ভায়ের ছেলে কেউ বাদ গেলাম না।

তিন চার মাসের মধ্যে তুলসীটা বেশ ডাঙর হয়ে উঠেছে। বাড়িঅলা সাহেবের বেগম মাঝে মাঝে কাজের মেয়েটি পাঠিয়ে দেন, যেন কিছু তুলসী পাতা তাঁর কাছে পাঠাই। তিনি সপ্তাহখানেক ধরে সর্দিকাশিতে ভুগছেন। সর্দিকাশিতে তুলসী পাতা খুব উপকারী। পাতা ছেঁড়ার কথা উঠলে সুশীলের মুখটা একেবারে ছোট হয়ে আসে। সে তখন কারো চোখের দিকে তাকায় না। তার এত দুঃখ হয়, অনেকক্ষণ ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন শুনতে শুনতে তুলসীর মহিমা আমি নতুন করে অনুভব করলাম। তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী কৃষ্ণ ভক্তিপ্রদায়িনী। গায়ক মেয়ে অণিমা আমাকে একটা মাটির বাতিদান উপহার দিয়েছিল। সেয়ানা হয়ে ওঠা তুলসী গাছের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য বাতিদানের ওপর একটা বড়সড় মোমবাতি বসিয়ে তুলসী গাছের তলায় রেখে দিলাম। আমার ঘরে চিন্ময়-রত্নেশ্বর-প্রণব-সমীর—জগন্নাথ হলের তরুণ বন্ধুরা এলে তুলসীতলায় মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে মজা করে বলতাম, দেখো শ্রীকৃষ্ণে তোমাদের ভক্তি জন্মায় কি না, আমি তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়ে দিলাম। পাছে সত্যি সত্যি তাদের কৃষ্ণে ভক্তি জন্মে যায়, এই ভয়ে তরুণ বন্ধুদের কেউ একজন চুপচাপ বাতিদানটা চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে দীপ জ্বালানো বন্ধ।

অল্প কিছুদিন না-যেতেই তুলসী গাছের ডালাপালা শাদামতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে ছেয়ে গেল। নয়নতারায় লাল বরন ফুল এল। প্রতিদিন কত ফুলই তো দেখি। তুলসী এবং নয়নতারার ফুল দেখে প্রাণে যে হিল্লোল জাগে, অন্য ফুলে তেমন হয় না কেন? বোধ হয় প্রাণের সঙ্গে সংযোগটি স্থাপিত হয়নি বলে। এই তুলসী এবং নয়নতারার শিশুগুলোকে একদম মৃত দশা থেকে বেঁচে উঠতে দেখেছি। আমার পালক ছেলে সুশীলের হাতের অনেক যত্নের পরশ পেয়ে তারাও বাড়ির ছেলের মতো বেড়ে উঠেছে। আমি যখন তুলসী এবং নয়নতারার ফোটা ফুলগুলো দেখি সেগুলোকে জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ বিজয়-মুকুটের মতো মনে হয়। তুলসী এবং নয়নতারার ফুল দেখে আমার জীবনের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস নতুন করে জন্মায়। আমার ভেতরে কে যেন বলে যেতে থাকে তোমার জীবনে দুঃখ কষ্ট যা-ই আসুক, তুমি ভেঙে পড়বে না। একসময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ তুমি পাবে। নীরবে তুমি কাজ করে যাও, ফুলের বাবার সাধ্যি নেই, না ফুটে থাকতে পারে।

আমার ছাদের নয়নতারা এবং তুলসীর মধ্যে সমঝোতার ভাবটি ভারি চমৎকার। নয়নতারার গাছগুলোতে যখন ছোট ছোট কুঁড়ি এল, তখনই তুলসী গাছটি পুষ্পবতী হয়ে উঠল। তুলসী গাছে যখন বীজ ধরল, নয়নতারা গাছের শিয়রেও বীজভরতি ক্যাপসুলগুলো দুলতে আরম্ভ করল। একই রকম জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে বলেই বোধকরি ফুল ফলানোর সময়ও দুই তরুতে এমন আশ্চর্য সহমর্মিতার ভাব। তুলসী বীজগুলো যখন খয়েরি হয়ে পাকতে আরম্ভ করল, দলে দলে চড়াই এসে গাছের পাতায় পাতায় ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে তুলসী বীজ ভক্ষণ করার একটা ধুম লাগিয়ে দিল। চড়াইদের চিৎকারে কানপাতা দায়। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, চড়াইরা কচকচ করছে তো করছেই আর ছোট ছোট ঠোঁটে তুলসী বীজ তুলে নিয়ে আহার করছে। কী কারণে বলতে পারব না, দেখা গেল নয়নতারার বীজের প্রতি চড়াইকুলের কোনো আগ্রহ নেই। সুতরাং নয়নতারার বীজগুলো ওপরের আবরণ ফাটিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। তুলসী বীজ খাওয়ার ভোজে চড়াইরা দূর দূর স্থান থেকে তাদের আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনল। সকলে মিলে কুট কুট কুট সারাদিন খেয়েও, সব বীজ খেয়ে ফেলা চড়াইকুলের পক্ষে সম্ভব হল না। ভালো করে পেকে যাওয়ার পর কিছু বীজ আপনা থেকেই মাটিতে ঝরে পড়ল। বোশেখের শেষাশেষি যখন বিষ্টি নামল, দেখলাম ছাদের অর্ধেকটা জুড়ে তুলসী এবং নয়নতারার চারা কানখাড়া করে দাঁড়িয়ে গেছে। বিষ্টিতে ভিজে রোদের তাপে স্নান করে, বাতাসে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে তুলসী এবং নয়নতারার কচি শ্যামল চারাগুলো ডাঁটো হয়ে উঠল, তাদের ফুল ফুটল। আমার ছাদের অর্ধেকটা তুলসী এবং নয়নতারায় ছেয়ে গেল। আমার ছাদের নয়নতারাগুলোর রং ছিল একেবারে সুরখ লাল। সুশীল কোত্থেকে ফুলকুঁড়িসুদ্ধ শাদা নয়নতারার আস্ত একটা বয়েসী গাছ তুলে এনে টবে পুঁতে দিল। নতুন গাছটা অভিমানে দুঃখে কিছুদিন ঝিম মেরে ছিল। আমরা ধারণা করেছিলাম বেচারি এই অজায়গায় আত্মহত্যা করে বসবে। লাল নয়নতারার গাছগুলো প্রাণের জোয়ারে তরতর করে বাড়ছে। এই শাদা নয়নতারাটি ভাবল এই প্রাণপূর্ণ পরিবেশে আত্মহত্যা করা অসম্ভব। সুতরাং সেও অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল। এইভাবে আমার ছাদে তুলসী

এবং লাল শাদা নয়নতারার একটা রাজ্য হয়ে গেল। লোকে বলতে পারে নয়নতারা এবং তুলসী এমন কী গাছ, তাদের ফুলেরও-বা কী বাহার। তাই নিয়ে এত আদিখ্যেতা, এত লেখালেখির কসরত কেন। আমি বলব, উপায় কী। এ গাছগুলো অর্ধেক প্রাণ থেকে এবং অর্ধেক ছাদ থেকে জন্ম নিয়েছে।

একদিন দুপুরবেলা ফারজানা এসে বলল, আপনার ছাদে নয়নতারাগুলোর পাশাপাশি কয়েকটি গোলাপের টব বসিয়ে দেন। ফুল ফুটলে বেশ দেখাবে। প্রস্তাবটা সুন্দর, কিন্তু মনে একটা দ্বিধার ভাব এল। পয়সা খরচ করে নার্সারি থেকে কুলীন পুষ্পের টব কিনে আনলে, আমাদের অর্ধেক প্রাণের ভেতর থেকে জন্মানো তুলসী এবং নয়নতারারা মনে মনে ব্যথা পাবে কি না। সেই সন্ধেবেলায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আনোয়ার কুঁড়িসুদ্ধ চারটে বড় বড় টব কিনে এনে নয়নতারার ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিল। সারা রাত ধরে আমার কেমন জানি মনে হতে থাকল, আমার নয়নতারারা কাঁদছে।

গোলাপের টব চারটের মধ্যে একটাকে চিনে নিতে কষ্ট হল না। ব্ল্যাক প্রিন্স। কালো রাজকুমার, রক্তের মতো গাঢ় লাল। পাপড়ি অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কানের মতো। আরেকটা সচরাচর যে গোলাপ পাওয়া যায় সর্বত্র, সেই জাতের, রং গোলাপি। বুকের কাছে নাসিকাটি বাড়িয়ে ধরলে অতিশয় স্নিগ্ধ কোমল একধরনের গন্ধে বুকটা ভরে ওঠে। আরেকটার রং ঈষৎ সিঁদুর বর্ণ, ইংরেজিতে বলতে হবে ভারমিলিয়ন। এই জাতের গোলাপের কী নাম আমি জানিনে। নামে কী আসে যায়, গোলাপ তো গোলাপই। চতুর্থটির রং হলুদের কাছাকাছি, নাম জানিনে, জানতে চাইনে। যদি হৃদয় স্পর্শ করতে পারে আপনা থেকেই গোলাপটির একটি নতুন নাম দেব। গোলাপগুলো যখন ফুটতে থাকল, আমি তাদের সঙ্গে নয়নতারাদের কোনো বিবাদ আছে তার আভাসটিও খুঁজে পেলাম না। বেশ তো আছে নয়নতারা এবং গোলাপ সৎ প্রতিবেশীর মতো। কিন্তু আমি ভাবলাম কেন গোলাপদের আগমনে নয়নতারারা বেজায়রকম বেজার হয়েছে? এখন বুঝতে পারছি এটা নয়নতারাদের মনের কথা ছিল না। আমার মনের কথাটিই তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। মানুষ সুবিধের জীব নয়, তারা নিজেদের মনের ময়লা কাদা এগুলো ফুলের শরীরে মাখিয়ে দিয়ে ভীষণ আনন্দ পায়।

নয়নতারা বারো মাস ফোটে না। তবে একবার ফুটলে মাসের পর মাস বোঁটার মধ্যে টিকে থাকে। ঝরে পড়ে না। গোলাপের সময়-অসময় নেই। আহার নিদ্রা ঠিকমতো হলে সব সময়ে ফুটতে রাজি। মানুষ এই পুষ্পটিকে নিয়ে যত ঘাঁটাপিটে করেছে, যত মাথা ঘামিয়েছে, টিউলিপ ছাড়া অন্য কোনো জাতের পুষ্প নিয়ে অত করেছে কি না সন্দেহ। মানুষ একই গোলাপকে কত রঙে কত আকারে তার মরজিমাফিক ফুটতে বাধ্য করেছে, বলে শেষ করা যাবে না। মানুষের সঙ্গে গোলাপের এত বেশি সান্নিধ্য, এত মাখামাখি, তাই গোলাপ সব সময়ে মানুষের ওপর একটুখানি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, নইলে পুষ্প বিকশিত করে তুলতে তার কষ্ট হয়। সেজন্য গোলাপ ফুটে ঝরার সময় হলে আস্ত বোঁটাটি কেটে ফেলতে হয়। এক শাখায় অবিরাম পুষ্প ফুটিয়ে যখন তার ক্লান্তির ভাব আসে, আস্ত শাখাটি ছেঁটে দিতে হয়।

নতুন যে ডাল মেলবে তার ভেতর অবশ্য অবশ্যই নতুন কুঁড়ি থাকবে। গোলাপ যখন বর্ণে গন্ধে পুরো বিকশিত হয়ে ওঠে, তাকিয়ে দেখলে মনে হয় তার ভেতর থেকে

ঈশ্বরীয় বিভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। কমবেশি সব পুষ্পের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন। কীভাবে বিরাজ করেন, আমি বলতে পারব না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনোখানে যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, শুধু পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য আমাকে একটা ঈশ্বর মনে মনে বানিয়ে নিতে হবে। গোলাপকে নিয়ে একটু গোলে পড়ে গেলাম। এই সুষমাসম্পন্ন পুষ্পটি দেবতার সেবায় লাগে না। দেবতার দুর্ভাগ্য না পুরুতের ঈর্ষা আমি কেমন করে বলব। পুজোয় কেন পুষ্পের প্রয়োজন হয়, এখন মনে হচ্ছে তার মাহাত্ম্য অল্পস্বল্প বুঝতে পারি। গাছের সঙ্গে ফলের সংযোগসূত্রটির যে মিলনবিন্দু, সেটাই তো পুষ্প। পুষ্পের মধ্যে গাছ এবং ফল দুইই বর্তমান রয়েছে। যেমন গোধূলির মধ্যে দিন এবং রাত যুগপৎ অবস্থান করে, তেমনি ফুলের মধ্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ ওর হাত ধরে সুখনিদ্রায় শয়ান রয়েছে। অনেক ভেবে দেখেছি, পুজোর চাইতে ফুলের কোনো উৎকৃষ্ট ব্যবহারের কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনে। যে-দেবতাকে ধরতে পারিনে, ছুঁতে পারিনে, তাঁর উদ্দেশে যদি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করি, তিনি হয়তো মুখ তুলে চাইবেন। থাকুক এসব কথা।

এরই মধ্যে সুশীল একটা কাণ্ড করে বসল। নীলক্ষেতে চিড়িয়ার দোকানে গিয়ে একটা ঝুঁটিশালিক কিনে খাঁচায় ভরে ঘরে নিয়ে এল। শালিকটি যাতে ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারে, সেজন্য হাজার টাকা খরচ করে বড় খাঁচা কিনলাম। এই শালিকটিকে লাল নীল হলুদ এসব রঙের একেকটি একেকদিন পানিতে গুলে গুলে স্নান করিয়ে তার বেবাক পালকের রং পালটে দিতাম। লোকে যখন পাখিটির নাম জানতে চাইত, একেক সময় একেক নাম বলতাম। কখনো বলতাম পাখিটি কামস্কাটকা থেকে আনা হয়েছে। কখনো কিলিমাঞ্জরো কিংবা উরুগুয়ে এসকল দেশের নাম বলতাম। লোকে অবাক হয়ে পাখিটির দিকে তাকাত। শালিকের সঙ্গে আমার শৈশবকালীন প্রণয়ের একটা দগদগে ক্ষত মনের ভেতর লুকিয়ে আছে। পাখিটি উপস্থিত মুহূর্তে ভিন দেশী পরিচয় নিয়ে খাঁচায় ঘোরাফেরা করুক, অথবা ছাতু খেতে থাকুক। আমাকে বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় উপলব্ধির বিষয়টি তার আগে প্রকাশ করতে হবে।

অনেকদিন পূর্ব থেকেই আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে। আল্লাহ্‌তালা তাঁর গোপন বাতেনি শক্তির একটা অংশ বৃক্ষজীবনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল করেছেন। এই কারণেই একদিন না একদিন মানুষকে বৃক্ষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মানুষ যদি বৃক্ষের শরণাগত না হয়, তার জীবনীশক্তিই জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ভেবে দেখুন আল্লাহ্ কী পরিমাণ বুদ্ধিমান। বৃক্ষের ভেতরে যে সরল জীবন-প্রবাহ স্পন্দিত হয়, তার সঙ্গে মানুষের হৃৎস্পন্দনের অবশ্যই একটা মিল আছে। প্রকৃতিগতভাবে উভয়ে একই বস্তু। কিন্তু তারতম্য হচ্ছে শক্তি এবং গতিশীলতার। গ্রিক পণ্ডিত আরিস্ততল তো মানুষকে চলমান উদ্ভিদ বলে অভিহিত করেছিলেন। একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক নির্মাণ করে, সেভাবে একজন মানুষ একটি বৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ? যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন, বৃক্ষেরও একটি জীবন্ত সত্তা রয়েছে, অন্য যে-কোনো প্রাণীর মতো।

আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। আগে আমি যে বাড়িটার নিচতলা থাকতাম, তার সামনে আঙিনামতো কিছু খালি জায়গা ছিল। বাড়িঅলা তাতে একটি

পেয়ারা এবং একটি লেবুর চারা লাগিয়েছিলেন। লোহার গেটের ওপর একটি মাধবীলতার ঝাড় মনের সুখে বাড়ছিল। আমি যখন সে বাড়িতে থাকতে এলাম, ভাবলাম একটা কি দুটো গাছ লাগিয়ে আমিও যে এ বাড়িতে বাস করেছি, তার একটা চিহ্ন রেখে যাব। আমি যেখানে যাই সেখানেই একটা কি দুটো গাছ সচরাচর লাগিয়ে থাকি। পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করত না। মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার নিরীহ কামনাই আমাকে গাছ লাগাতে বারবার প্রণোদিত করত। মিরপুরের রূপনগরে একসময়ে আমি একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। ব্যালকনিতে একটি ড্রাম কেটে মাটি ভরতি করে একটি কমলার চারা লাগিয়ে, বাড়ির ছেলের মতো আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে সেই শিশুচারাটিকে বড় করে তুলেছিলাম। কমলা গাছটি ছাদ ছুঁইছুঁই করছিল, ড্রাম থেকে উঠিয়ে নিয়ে পেছনে পাম্প হাউজের কাছে গভীর গর্ত করে চারাটিকে পুনঃরোপণ করেছিলাম। গাছটি টিকে গিয়েছিল। আমি যখন সুলতানের কাছে ফ্ল্যাটটি বেচি, সুলতান কথা দিয়েছিল সে গাছটির সেবাযত্ন করবে। গাছের যত্ন করবে এ করারে সুলতানের কাছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম কম নিয়েছিলাম। আমি সব সময় গাছটির খবর নিতাম। একদিন শুনলাম গাছটিকে কেটে ফেলা হয়েছে। এখন সুলতান যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমার মনে হয় না তার সঙ্গে আমি প্রসন্নভাবে কথাবার্তা বলতে পারব।

সেই তিনতলা বাড়ির কথায় আসি। আজিজুল হক সাহেবের বাড়ির সামনে একটি নার্সারি আছে। একদিন হক সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে জানতে চাই তাঁদের ওখানে কী কী চারা আছে। মালিটি জানাল সম্প্রতি তাদের দোকানে আপেল এবং আঙুরের চারা এসেছে। আমি জানতে চাইলাম আমাদের দেশে কি আপেল হয়? মালী একগাল হেসে বলেছিল, হ্যাঁ স্যার আজকাল বাংলাদেশে বেশ আপেল হচ্ছে। গুলশানের তামান্না বেগম, ধানমণ্ডির সাব্বির সাহেবের বাড়িতে আপেল ধরেছে। একেকটা ইয়া বড় বড়। সে হাত জোড়া করে সাইজটা দেখাল। আমি যদি জানতে চাইতাম আরো অনেক সফল আপেল চাষির নাম হয়তো বলে যেত। একশো বিশ টাকা দিয়ে একটি আপেল এবং পঞ্চাশ টাকায় একটা আঙুর চারা কিনে নিয়ে এলাম। আমিও বিশ্বাস করিনি, আমাদের মাটিতে আপেল হবে, তবুও মালীর কথায় আপেল ধরার সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দিতে পারলাম না। হয়তো মালি মিথ্যে বলেছে, আমি চেষ্টা করে দেখিনা কেন? পেয়ারা, লিচু, কামরাঙা, সবরি কলা, আনারস, গোলআলু, শালগম, বাঁধাকপি, ফুলকপি এসব ফল এবং আনাজ আমাদের দেশে বিদেশীরাই বাইরে থেকে এনে ফলিয়েছে। সুতরাং আমিও পরখ করে দেখিনা কেন?

আঙুর চারাটির কথা আমি বলব না। ওই পোড়ারমুখো দ্রাক্ষার বেটি আমাকে মস্ত একটা দাগা দিয়েছে। আমার দুবছরের মেহনত বরবাদ গেছে। সার, মাটি এসব তৈরি করতে ঝাড়া আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। ফল ফলানোর কথা দূরে থাক, একটি ফুলের ইশারাও তার শাখাপল্লবে কখনো জাগেনি। অথচ তার দেড় বছর পরে কাশিমপুরের খামার থেকে এনে যে চারাটি বেবিকে দিয়েছিলাম, ছমাস না যেতেই তাতে চুনচুনে মিষ্টি আড়াই কেজির মতো আঙুর ধরেছে।

আপেল চারাটি এনে সে তিনতলা বাড়ির আঙিনাতে লাগালাম। বিদেশী অতিথি এলে যেমন আমাদের বাঙালি বাড়ির আয়েব তাদের চোখে ধরা না পড়ে মতো, বেশি বেশি আতিথ্য প্রদর্শন করি, আমি ধরে নিলাম এই আপেলশিশুটিও সেই পরিমাণ আদর যত্নের দাবিদার। অতিথি তরুটি মনে মনেও যাতে কোনো নালিশ না করতে পারে, তাই পুরো সেবাযত্নের ভার নিজের হাতে তুলে নিলাম। নিজের হাতে গোড়ায় দুবেলা পানি দিই। মাসে একবার গোড়ার মাটি তুলে গোবরের সঙ্গে ফসফেট ইউরিয়া মিশিয়ে তরুশিশুকে বিশেষ পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত করে খেতে দিই। সকালে উঠে ডালপালা পত্রপল্লবের ওপর হাত বুলিয়ে আদর করি। বাইরে যাওয়ার সময় আরেক বার। এমনিভাবে আদর জানাতে জানাতে একসময় অনুভব করি এই তরুশিশুটির প্রতি আমার এক বিশেষ মায়া জন্মে গেছে। তাড়াহুড়োর কারণে কখনো যদি গাছটির শিয়রে হাত না বুলিয়ে বাইরে যাই, আমার মনটা আপনা থেকে আইঢাই করতে থাকে। আপেলশিশুর পত্রপল্লব আকর্ষণ করে আদর না জানালে রাতে আমার ঘুম আসতে চায় না। আপেল গাছটি দিনে দিনে যেমন বাড়ছে, তেমনি আমার চেতনায়ও একটু করে সে অল্প অল্প স্থান দখল করে নিচ্ছে। একদিনের জন্যও কোথাও যেতে হলে আমার মনটা ধক করে ওঠে। আমি যদি চলে যাই বৃক্ষশিশুটি একেবারে একা থাকবে। একজন মানুষের আরেকজন মানুষের প্রতি যেমন ভালোবাসা জন্মায় এই গাছটির প্রতিও আমার মনে সেরকম স্থায়ী অনুরাগ জন্ম নিল। অথচ ওকথা কাউকে বলার উপায় নেই। লোকে শুনলে হাসবে। তা হাসুক। কিন্তু আমার অনুভূতি তো মিথ্যে নয়। আমার মনে কী করে জানিনে একটা ধারণা গজাল বন্ধু বন্ধুকে যেমন চিনতে পারে, গাছটিও তেমনি আমাকে চেনে। আমি জানি এই আপেল তরুটির সঙ্গে কোন অদৃশ্য বন্ধনে আমি আটকা পড়ে গেছি। গাছটিরও কি আমার প্রতি তেমন অনুভূতি জাগে?

এক সন্ধেবেলা একজন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। এ মানুষটির সঙ্গে আমার শিশুবেলার অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। মনটা খারাপ ছিল। ঘুম আসছিল না। বিছানা থেকে উঠে গাছটির কাছাকাছি একটি মোড়া নিয়ে বসে মনে মনে আত্মীয়টির স্মৃতি নাড়াচাড়া করছিলাম। এই সময়ে একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে। আপেল চারাটি সারা শরীর আন্দোলিত করে শাখা পল্লব দুলিয়ে হঠাৎ আমার শরীর স্পর্শ করল। আমার খালি গা, মনে হল, আপেলশিশু আমার বেদনায় সমবেদনা প্রকাশ করছে। সচেতনভাবে চিন্তা করে দেখলাম, তা কেমন করে হয়। বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ তরুশিশুটি একপাশে হেলেছে। আমার পরখ করে দেখার একটা ইচ্ছে জাগল। উত্তর দিকটিতে বসেছিলাম। দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণে এসে বসলাম। আবার দেখি আপেলশিশুর মাথাটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প হেলতে হেলতে নত হয়ে আমার বুক স্পর্শ করল। পুবদিকে, পশ্চিমদিকে গিয়ে বসলাম। প্রতিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এবার আরেকটু দূরে সরে গিয়ে একটি হাত একটুখানি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সত্যি সত্যি তরুর একটি শাখা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আলতোভাবে আমার হাত ছুঁয়ে গেল।

সেই রাতের পর আমার ঘুমের সময়সূচি পরিবর্তন করতে হল। আধারাত হলে আমি জেগে উঠি এবং বুকের ভেতর একটা বোবা টান অনুভব করতে থাকি। আমাকে

আপেল গাছটির সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাগে। তরুশিশুটির এগিয়ে আসতে সময় লাগে। লিখিত ইতিহাসের তলায় যে অবচেতন প্রবাহ ধীরে ধীরে কাজ করে যায়, তরুর চলাও সেরকম। কোনোরকমের তাড়াহুড়ো নেই। জেগে আছে অথচ চাঞ্চল্য নেই, মানুষ তরুর কাছে এই মৌন জাগরণের স্বভাব আয়ত্ত করে, তবেই তপস্যা করতে শেখে।

একজন হাতুড়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞানী আমার কাছে একদিন এসে ঘটা করে বলল, আমি যদি আপেল গাছের গোড়ার মাটির আঁশ বদলে দিতে পারি তা হলে আপেল ধরবে এবং মিষ্টি হবে। সে আমাকে গাছের গোড়া খুঁড়ে তাজা চুন দেয়ার পরামর্শ দিল। আমি এই হাতুড়ের কথা শুনে গোড়ার মাটি উঠিয়ে নিয়ে গর্ত করে এক কেজি চুন মিশিয়ে দিলাম। এই কর্মটি করার পর আমাকে কলকাতা যেতে হল। এক সপ্তাহ সেখানে থাকতে হল। আরো তিনদিন থাকার কথা ছিল। একরাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার আপেলশিশুটির প্রতিটি পাতা থেকে টুপ টপ করে পানি ঝরে পড়ছে। গাছটির চেহারা মলিন এবং বিবর্ণ। আমার মনটা ধক করে উঠল। ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে আমি বুঝে নিলাম, আমার আপেলশিশুটির কোনো বিপদ ঘটেছে। নইলে পাতা থেকে এমন করে অশ্রুবিন্দুর মতো পানি ঝরবে কেন! আমার বুকটা গুড়গুড় করতে থাকল, তা হলে কি আমি গোড়ায় তাজা চুন দিয়ে শিশুটিকে খুন করেছি। মনটা ভীষণ আউলা হয়ে উঠল। কলকাতার বন্ধুরা বলল আরো কয়েকটাদিন থেকে যাও। আমি বললাম, সম্ভব নয়। হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে বাংলাদেশ বিমানের লোকদের ধরে পড়ে ফেরার তারিখ দুদিন এগিয়ে এনে, চলে এলাম।

বাড়িতে এসে দেখি আমার আপেলশিশুর পাতাগুলো একেবারে হলদে হয়ে গেছে। দেখে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরল না। চুন বিষক্রিয়া করে যাচ্ছে শেকড়ে শেকড়ে। আহা বাচ্চাটির কী কষ্ট হচ্ছে। কী করে শিশুটিকে বাঁচিয়ে তোলা যায় সে চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলাম। আমার এক বন্ধু জয়দেবপুর কৃষি খামারে গাছপালা নিয়ে গবেষণা করে। তার কাছে ছুটে গিয়ে সবকিছু খুলে বললাম। সে বলল, তুমি আস্ত একটা শুয়োর। নইলে কেউ কি গাছের গোড়ায় তাজা চুন দেয়? আমি বললাম, দোস্ত তুমি শুয়োর গাধা যা ইচ্ছে বলো। কিন্তু আমার আপেল চারাটি বাঁচানোর উপায় বাতলে দাও। সে অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে মরণাপন্ন রোগীর শিয়রে বসে ডাক্তার যেমন করে কথা বলে, তেমনিভাবে বলল, চারাটি শেকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দেখো, বাঁচলে বাঁচতেও পারে। কিন্তু শেকড়গুলো ভালো করে ধুয়ে ফেলবে, চুনের কোনো স্পর্শ যাতে না থাকে।

আপেল শিশুটিকে অন্য জায়গায় রোপণ করলাম। বেঁচেও উঠল। কিছুদিন না-যেতেই ডালপালা ঝাঁকড়া হয়ে উঠল। কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলাম, আমি কাছে দাঁড়ালে তার ডালপালা আমার শরীর স্পর্শ করতে ছুটে আসে না। আমার ওপর তার ক্ষোভ অভিমান এবং অবিশ্বাস গাঢ়মূল হয়েছে। একবার আমি তাকে খুন করার চেষ্টা করেছি। সে কেন আমাকে প্রীতি নিবেদন করবে। তার অবিশ্বাস এবং সন্দেহ দূর করতে আমার চার মাস সময় লেগেছে। গাছ কিছুই ভোলে না, সবকিছু মনে রাখে।

উনিশশো আশি সালের আগস্ট মাসের দিকে হবে। টিপু সুলতান রোডে দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার অফিসে গিয়ে নিশ্চিত হলাম, পত্রিকাটি মরতে যাচ্ছে। আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। এত চেষ্টাচরিত্র, এত পরিশ্রম সব বৃথা যাচ্ছে। কতজনের কাছে ভিক্ষে করলাম। দেশী, বিদেশী কত মানুষের দুয়ারে টাকার জন্য ধন্না দিলাম। যা হওয়ার কথা ছিল তাই হতে যাচ্ছে। আগামীকাল থেকে মেহনতি জনগণের মুখপত্রটি মুখ বুজে আত্মহত্যা করবে।

বানের জল সরে গেলে যেমন পড়ে থাকে থিকথিকে কাদা, বিপ্লব করার প্রাথমিক জোশ কেটে যাওয়ার পর অবিশ্বাস, সংশয়, কাদা ছোড়াছুড়ি, এগুলো ওপরে উঠে আসতে শুরু করেছে। অতীত শোভাযাত্রা স্লোগান এসবের কথা যখন ভাবি মনে হতে থাকে নায়াগ্রার জলপ্রপাতের গর্জন আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বিপ্লব, আকাশের পূর্বে জেগে ওঠা রঙিন রামধনুর বিলীয়মান আভার মতো সবকিছু কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই এতগুলো বছর আমি কোন মরীচিকার পেছনে ছুটলাম! এখন অনুভব করছি, আমি ভীষণ ক্লান্ত এবং ভীষণ একাকী। আমার সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে কেউ কোথাও নেই। আমার চিৎকার করে অভিসম্পাত দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু আমার যৌবন এবং আমার সময় ছাড়া অভিসম্পাত দেয়ার মতো মনে মনেও কাউকে খুঁজে বের করতে পারছিলাম না।

গণকণ্ঠ অফিস থেকে বেরিয়ে একরকম ঘোরের মধ্যে হেঁটে নওয়াবপুর রোডে চলে এলাম। বিপ্লবের সম্ভাবনা যখন অতলে তলিয়ে গেল, আমার সাধ, আহ্লাদ স্বপ্ন বাসনা সবকিছু তার সঙ্গে ছারখার হয়ে গেল। আমি অস্তিত্বের সবকিছু আগামী বিপ্লবের উদ্দেশে নিবেদন করেছিলাম। আজকে অনুভব করছি, আমি গায়েগতরে তরুণ হলেও আমার ভেতর বুড়ো মানুষের ইচ্ছেশক্তিও নেই। আমি হাঁটছি, কিন্তু কোনো গন্তব্য নেই সামনে। অনেক সময়েই এমন হয়, মন নিজের ভেতর পাখা গুটিয়ে বসে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যান্ত্রিকভাবে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে।

নওয়াবপুর রোড থেকে হেঁটে গুলিস্তান চলে এলাম। ওখান থেকে বাসে চাপলাম। বাস শাহবাগ থামলে নেমে পড়লাম। সে সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে থাকতাম। তখন জিয়া হল, মুজিব হল এগুলো জন্মায়নি। শাহবাগের পাশ থেকে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা একদম ফাঁকা ছিল। শাহবাগ থেকে জাদুঘরের পাশ ঘেঁষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাওয়ার একটা চিকন রাস্তা ছিল। তখন গোটা কাঁটাবন এলাকা জুড়ে সারসার বস্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কাঁটাবনের মসজিদটারও তখন জন্ম হয়নি। বাঁশের বেড়া এবং ঢেউটিনের একটি নামাজঘর ছিল। এই নামাজঘরের পাশ দিয়ে আরেকটি চিকন আলপথ মুহসিন হলের কোনায় গিয়ে ঠেকেছিল।

আমি শাহবাগের রাস্তা ধরে পশ্চিমমুখো হয়ে হেঁটে আসছিলাম। মনে মনে কাঁটাবন নামাজঘরটির সামনের পথ দিয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে উঠব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ পথের ওপর থ্যাতলানো একটি বেগুন চারা দেখতে পেলাম। দেখে আমার বড় মায়া হল। আহা বেচারি বেগুনের শিশু চারাটি। জুতোর তলায় থেঁতলে গিয়ে কী কষ্টই নাজানি পেয়েছে। নিজের অজান্তে মাটিতে উপুড় হয়ে চারাটি তুলে নিলাম। কেন এ

কাজ করে বসলাম বলতে পারব না। হয়তো প্রাণবান জিনিসের অনুচ্চার আবেদন আমার ভেতরের কানে শুনতে পেয়েছিলাম। চারাটি হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে আমি হোস্টেলে চলে গিয়েছিলাম। আমার পাতানো বোন শাহানা আমাকে জিগগেস করল, আপনার হাতে ওটি কী? আমি বললাম, বেগুনের চারা। মানুষের পায়ের তলায় পড়ে থেঁতলে গিয়েছে। শাহানা বলল আপনি থেঁতলানো বেগুন চারা দিয়ে কী করবেন? আমি বললাম এটা দেয়ালের বাইরে কারনিসের নিচে যে মাটিটুকু আছে সেখানে লাগিয়ে দেব। তুমি এক বদনা পানি দাও। শাহানা পানি এনে দিল। আমি দেয়ালের ওধারে গিয়ে চারাটা একটুখানি গর্ত করে পুঁতে দিলাম। আহা হতভাগী শাহানা! আজকের দিনে তোমার চোখে চোখে তাকানোর ক্ষমতাও আমার নেই। আমার সঙ্গে যদি তোমার পরিচয় না হত হাবিবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হত না। হাবিব রোকেয়া হলের পাশে মটর সাইকেল থেকে পড়েই মারা গেল। শাহানা বোনটি আমার, তোমার মন্দভাগ্যের জন্য আমার নিজেকে কেন দায়ী মনে হয়। আমি কি কখনো তোমার অকল্যাণ কামনা করেছি?

তার পরের দিন ভোরবেলা মর্নিং ওয়াক সেরে আসার পথে কৌতূহলবশত দেয়ালের বাইরে চারাটি কেমন আছে উঁকি মেরে দেখলাম। অবাক কাণ্ড, দেখি চারাটি পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মনে হল চারাটি লাজুক হাসি হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই থ্যাঁতলানো চারাকে একটা রাতের মধ্যে এমনভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে আমার ভেতরে একটা তোলপাড় হয়ে গেল। এই থ্যাঁতলানো বেগুনের চারা যদি উঠে দাঁড়াতে পারে, আমারো তো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার সম্ভাবনার সব পথ এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। আছে, এখনো আমার আশা আছে। আমি আবার নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করতে পারি। গণকণ্ঠ অফিস থেকে আসা অবধি আমার মনে একটা বেদনার অঙ্কুশ বর্শার মতো ঝুলছিল। বিগত রাতে আমার একটুও ঘুম হয়নি। কেবল পায়চারি করেছি আর ভেবেছি কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল। যেদিকেই তাকাই অন্ধকার দেখি। চারাটিকে এভাবে বেঁচে উঠতে দেখে আমার মনের পেশি সকল মনের ভেতর শিশুর হাত-পা ছোড়ার মতো করে ঢেউ তুলতে লাগল। এখনো আমি একেবারে আনকোরা তরুণ। যদি লেগে পড়ি কতকিছু তো করতে পারি।

নাশতা খেয়ে জামা গায়ে দিয়ে ঢাকা কলেজের সামনে যেখানে চারা বীজ এসব বেচা হয়, সেখানে ছুটলাম। উৎসাহের আতিশয্যে খেয়াল করিনি, এত সকালে চারা-বিক্রেতা তার পণ্যসম্ভার নিয়ে আসে না। অতিআগ্রহের জন্য মনে মনে লজ্জিত হলাম। আজিমপুর এক বন্ধুর বাড়িতে কিছুক্ষণ গল্প করে কাটালাম। ফেরার পথে দুটাকা দিয়ে বারটি সতেজ হৃষ্টপুষ্ট বেগুন চারা কিনে নিয়ে এলাম। এবারেও শাহানার সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, শাহানা এবার বদনাতে হবে না, বালতি ভরে পানি দাও। শাহানা বলল, আপনার হয়েছে কী? বালতিভরা পানি দিয়ে কী করবেন? আমি বললাম, বাজারে গিয়ে আরো বারোটি বেগুনের চারা এনেছি। শাহানা পানিভরতি বালতি এগিয়ে দিতে দিতে বলল এত বেগুন চারা লাগাচ্ছেন কেন? আমি বললাম আমার হাউস লাগছে। সে আবার বলল, বেগুন ধরলে আপনি কী করবেন?

আমি তৎক্ষণাতই জবাব দিলাম, খাব, বিলাব, বাজারে নিয়ে বেচব। সেই বারো চারাও কারনিসের নিচের মাটিতে লাগিয়ে দিলাম। এবার একটু কষ্ট করতে হল। আগাছা ঝোপঝাড়ে সরু মাটির আলমতো জায়গাটা ঢাকা ছিল। সেগুলো উপড়ে ফেললাম। চারা লাগাবার আগে বঁটি দিয়ে মাটিও আলগা করে দিলাম। তারপর সবগুলো চারার গোড়ায় পানি ঢেলে দিলাম। রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিলাম, নতুন লাগানো চারাগুলোর কথা ভেবেছি। আগামী সকালে বারোটা চারা একসঙ্গে যখন মাথা তুলে দাঁড়াবে কী সুন্দর একটা ব্যাপার হবে। পরের দিন মর্নিং ওয়াকেই গেলাম না। দেয়ালের কাছে গিয়ে চারাগুলো দেখলাম, সবগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। আমার বুকের ভেতরে কী দাপাদপি। শাহানাকে ডাকাডাকি করলাম না। বালতি করে নিজেই পানি বয়ে, চারাগুলোর গোড়ায় দিলাম। নিজের কাজের মূল্য এমন করে আর কোনোদিন বুঝিনি।

সেদিনই বিকেল থাকতে থাকতেই চারাবিক্রেতার কাছে ছুটে গেলাম। তাকে বললাম, ভাই আমাকে দশ টাকার বেগুন চারা দিন। চারাবিক্রেতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, কোন বেগুনের চারা দেব। বেগুন মানে বেগুন, তার আবার রকম কী। চারাবিক্রেতা আমাকে জানাল গোল বেগুন, লম্বা বেগুন, গফরগাঁওয়ের বেগুন, বারোমেসে বেগুন, নানান বেগুনের চারা তাঁর কাছে মজুত আছে। কোন বেগুনের চারা আমার চাই। আমি একটুখানি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার বন্ধু আবুল কাসেম ফজলুল হকের বাড়ি গফরগাঁও নগরীর কাছে পাকুন্দিয়া মোকামে, আমি দেখেছি, তাকে ইজ্জত দেয়ার একটা মওকা পাওয়া গেছে। আমি বললাম, ঠিক আছে গফরগাঁওয়ের চারাই দেন। দোকানি হেসে জিগগেস করলেন, গফরগাঁওয়ের বেগুনের চারা কে নিবেন, কীরকম মাটিতে লাগাবেন? চারাঅলার প্রশ্নে আমি একটুখানি মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমি তো কারনিসের নিচে দেয়ালের বাইরে চিকনমতো বাড়তি মাটিতে চারা লাগাচ্ছি। একগাদা মানুষের সামনে চারাঅলার কাছে কী করে আমার জমিনের পরিমাণের কথা বলি। শুনলে লোকে হাসবে। তথাপি বলতে হল, কারনিসের নিচে দেয়ালের বাইরে বাড়তি মাটিটুকুই আবাদ করছি। চারাঅলা তার হিসেবে আমার কথাটা বুঝে ফেলল, ও বুঝলাম ভিটেবাড়ি, ওতে গফরগাঁওয়ের বেগুন সুবিধার অইব না। আপনি বারোমেসে বেগুনের চারা নিয়ে যান। ওইরকম জায়গায় এই জাতের বেগুন খুব ভাল হয়। আমি দেখলাম, বন্ধু ফজলুল হককে ইজ্জত দেখানোর যে একটা মওকা পেয়েছি, চারাঅলার কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের ধাক্কায় সে সুযোগটা ভেসে যাওয়ার উপক্রম। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনার কথা থাকুক, আমার কথাও থাকুক। পাঁচ টাকার গফরগাঁওয়ের বেগুনের চারা, আর পাঁচ টাকার বারোমেসে বেগুন দিন। চারাঅলা দাঁত বের করে হেসে ফেলল। সাব আপনি আসল বেগুন চাষা নন, শখের বেগুন চাষা। চারাবিক্রেতারও ব্যঙ্গ করার একটা ভাষা আছে, প্রথম টের পেলাম।

একেকটা চারা দশ টাকার কিনেছি বলে চারাঅলা আমাকে টাকায় দশটি করে চারা দিলেন। একেকটা বোঁটা ওঠা চারার আঁটিটা নেহাত ছোট নয়। শাক হিসেবে পাঁচ ছয়জন মানুষের একটি পরিবারের দুবেলার সবজি হতে পারে। এই মোটা চারা কপালে তুলল। সে বলল, আপনাকে কি ভূতে পেয়েছে?

চারা আপনি করবেন কী? আমি বললাম, পূর্ব পশ্চিমে এই হোস্টেলটা যতখানি লম্বা, তার নিচের সব জায়গাতে লাইন করে বেগুনের চারা লাগাব। শাহানার বর হাবিব বললেন, আপনি একা সামলাবেন কী করে, অন্তত দেড়শো হাত লম্বা পাইপ লাগবে। ঝাঁজরি লাগবে, গোবর লাগবে, ফসফেট ইউরিয়া কতকিছু দরকার হবে। আমি বললাম, পাইপ, ঝাঁজরি, ফসফেট গোবর আমি সব কিনব। হাবিব চুপ হয়ে গেল।

শাহানার বাচ্চা নীনু এবং কোয়েলকে বললাম, মামা এখন তো তোমাদের স্কুল ছুটি। কাল চারাগুলো লাগাবার সময় তোমরা কি একটু মামাকে সাহায্য করবে? চাষবাসের কাজে তোমরা সাহায্য করলে তোমাদের আমি ক্রিকেটের ব্যাট কিনে দেব। ছোটটি চোখ টিপল। বুঝলাম রাজি আছে। মার সামনে কবুল করতে একটু অসুবিধে। পাগলের সঙ্গে পাগলামো করতে কে ছেলেকে দিতে চায়?

কোয়েল, নীনু এবং আমি এই তিনজনে মিলে একশো হাত দীর্ঘ দেয়ালের পাশের আলের মতো সরু, মৃত্তিকারেখাটির এপাশ-ওপাশ এক হাত অন্তর একটি করে বেগুন চারা পুঁতে দিলাম। যখন কাজটা শেষ করলাম মনের ভেতর একটা গভীর প্রশান্তি বোধ করলাম। আমার করার কিছু নেই, একথা সত্যি নয়। আমিও একটা কাজ পেয়ে গেছি। শাহানা বলল আপনার বেগুন চারাগুলোর জন্য আপনাকে সত্যি সত্যি পাইপ কিনতে হবে। আমি বললাম আমাকে কী মনে করেছ তুমি শাহানা, আজই পাইপ কিনব এবং সন্ধেবেলাতেই পাইপ দিয়ে চারাগুলোর গোড়ায় পানি দিলাম। কোয়েল এবং নীনু জানতে চাইল, মামা চাষবাস এখানেই শেষ? নাকি আপনার কৃষি সম্প্রসারণ কর্ম চলতেই থাকবে। আমি বললাম, অত উতলা হচ্ছ কেন। আগামীকাল লাগানো চারাগুলোর অবস্থা দেখি। তারপর সিদ্ধান্ত নেব। রাতে একধরনের শান্ত উত্তেজনার ভেতর আমি আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। এই এতগুলো বেগুন চারা সবগুলো যদি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়, কেমন দেখাবে?

আমি অন্তত দশ বছর কাজ করেছি বিপ্লবের পেছনে। এই এতদিন একটানা দিনরাত কাজের ফল কী হয়েছে দেখবার সুযোগ কোনোদিন হবে না, কৃষ্ণের গরু চরানোর মতো। ছোটবেলায় বায়োস্কোপের চোঙে মুখ লাগিয়ে দেখতাম, বায়োস্কোপঅলা বামহাতে কার্ড পালটাচ্ছে, তার বাম হাতে ঘণ্টি টুংটুং বাজাচ্ছে, মুখে সুর করে উচ্চারণ করে যাচ্ছে—আকার দেখো প্রকার দেখো, জার্মানির যুদ্ধ দেখো, কামান দেখো বন্দুক দেখো, কত কত সৈন্য দেখো, আগ্রার তাজমহল দেখো, রাম-রাবণের লড়াই দেখো, বীর হনুমান দেখো, সীতা দেবীর কাঁদন দেখো, ছিরি কিষ্ণের মন্দির দেখো ...। এই দেখো দেখোর মধ্যে কৃষ্ণের গরু চরানোর একটি আইটেমও ছিল। এক মানুষ কঞ্চি হাতে বিশাল চারণভূমিতে ছুটে বেড়াচ্ছে, মলমূত্র পরিষ্কার করে যাচ্ছে, কিন্তু যে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে কৃষ্ণের চরানো। স্বচক্ষে গরু যদি দেখবে তা হলে কৃষ্ণের গরু চরাতে যাবে কেন, নিজের ঘরের গরুই চরাত। বিপ্লবের কাজ কৃষ্ণের গরু চরানোর মতো। কাজ করে যাবে ফল দেখবে না। দেখতে পাবে না।

সচরাচর যখন ঘুম থেকে উঠি তার অনেক আগে বিছানা ছাড়লাম। গতকাল এই এতগুলো চারা লাগালাম, তাদের কী হল দেখার জন্য মন বড় হাপিত্যেশ করছে।

গেটের গোড়ায় গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দারোয়ান গেটের পাশে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগাতে হল। এখনো মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দেয়নি। এত সকালে তাকে জাগালাম কেন হেতুটি দারোয়ান বুঝতে পারল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, সাব কি স্টেশনে যাবেন? আমি বললাম, না বাবা। দেয়ালের ওপাশে একশো বেগুন চারা লাগিয়েছি, সেগুলো কানখাড়া করেছে কি না দেখতে চাই। দারোয়ান বিরস মুখে গেট খুলে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হোস্টেলের সামনের মাঠটিতে সামান্য সামান্য শিশির পড়েছে। এখন কৃষ্ণপক্ষের রাত। ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আমি দেয়ালের গোড়ায় গিয়ে প্রতিটি চারার কাছে গিয়ে দেখি সবকটা চারা দাঁড়িয়ে আছে। কেবল বরই গাছের তলায় একটি চারা দেখলাম মাটিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। না লাগাতেই পোকা চারাটিকে খতম করে দিয়েছে। বাকি একসঙ্গে দাঁড়ানো চারাগুলোকে লাইন করে দাঁড়ানো সেনাবাহিনীর জওয়ানের মতো মনে হল। এই জওয়ানদের কথা মনে এল কেন বলতে পারব না। হয়তো হামেশা তাদের সবখানে দেখতে হয় বলেই মন আপনা থেকে তাদের কথা মনে তুলল। গাঢ় দইকে চামচ দিয়ে নাড়লে কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেরকম ফিকে টুকরো টুকরো অন্ধকার আকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে জেগে আছে। শেষরাতে ফিকে হয়ে আসা এই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে কী অপূর্ব সুন্দর দেখায়। এই মাঠে দাঁড়িয়েই নানা জায়গায় চার পাঁচটা দোয়েলকে শিস দিয়ে উঠতে শুনলাম। রাত্রিশেষের আবছা নরম নরম অন্ধকারের ভেতর দোয়েলের একটানা শিস যখন শুনলাম, আমি মনে করলাম এই শিসের সঙ্গে গাছপালার বেড়ে ওঠার অবশ্যই একটি সম্পর্ক আছে। এখানে-ওখানে কাকদের ডানা ঝাপটে ডেকে উঠতে শুনলাম। মুহসিন হলের প্রভোস্টের বাড়ি থেকে মোরগ উঁচু স্বরে ডাক দিল। মোরগের ডাকের মধ্যে সূর্যের উদয়রাগের কিছু লালিমা মাখানো আছে মনে হল। তারপরে মুয়াজ্জিন আজান দিল। তার পরেই ডালে ডালে শাখায় শাখায় নানা রকমের পাখি কিচিরমিচির চিৎকার করতে আরম্ভ করল।

আমি ভাবলাম, একেবারে মর্নি ওয়াকটা সেরে এলে মন্দ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ পেরিয়ে, সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের গেট বরাবর হেঁটে রমনা পার্কে এবং রমনা পার্ক ছড়িয়ে কাকরাইল মসজিদের গোড়ায় এলাম। ভেতরে ফজরের নামাজের জামাত চলছে। কেরাতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। নামাজশেষে দেখলাম মুসল্লিরা বেরিয়ে এসে পাউরুটি এবং পাকা কলা দিয়ে নাশতা করছেন। কেউ ইটের ওপর বসে চাপাতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডাল দিয়ে খাচ্ছেন। অধিকাংশের মাথায় টুপি শাদা ফুলের মতো ফুটে আছে। সব্বাই লম্বা জামা পরেছে। ইত্যাকার একটা দৃশ্যাবলি দেখে মনে হল আমি নতুন একটা দেশে এসে গেছি। আমার ভেতরে কেমন অনুভূতি খেলে যাচ্ছিল। আমার সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে এই ভোরের শান্ত স্বভাব এমন একটা স্নিগ্ধ দোলা সঞ্চার করছিল, মনে হচ্ছিল আমার বুকে সমস্ত পৃথিবীটা এসে বাসা বেঁধেছে। আমার বুকে ঘাস গজাচ্ছে, বেগুন চারা সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বৃক্ষ পত্রপল্লব বিস্তার করছে, বিহঙ্গ গান করছে; আর সকালের পৃথিবীটা দুধে-ভেজা পাউরুটির মতো আর্দ্র হয়ে উঠেছে।

হোস্টেলে যখন ফিরলাম রীতিমতো সকাল হয়ে গেছে। হোস্টেলের বোর্ডারেরা জেগে উঠে ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষছে এবং দোতলা তিনতলার ওপর থেকে পেস্টমিশ্রিত

শাদা জলীয় পদার্থ মুখ ফাঁক করে রেলিং গলিয়ে নিচে ছুড়ে দিচ্ছে। আমি প্লাস্টিকের পাইপটার এক মুখ বাথরুমের কলটার সঙ্গে লাগিয়ে পানি ছেড়ে দিলাম। পাইপের অপর প্রান্তটা টেনে টেনে চারার গোড়ায় গোড়ায় নিয়ে গেলাম। পাইপের ভেতর দিয়ে কলকল করে পানি ছুটে এল। জোরে বেরিয়ে এসে যখন ছিটকে পড়ে পানিকে তখন দুধের মতো শাদা দেখায়। পাইপটির ভেতর দিয়ে সিরসিরিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেখে আমার একটা মজার ভাবনা এল। এই পাইপের ভেতর দিয়ে একটা নদী ছুটছে। একটা সমুদ্র গর্জাচ্ছে। পানি মানেই তো সমুদ্র। পানি মানেই তো নদী। একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সেই শান্ত নরম সকালের স্নিগ্ধ সুরটি কেটে গেল। নাহিদের বউ আসমা বেগম সকালবেলা সেজেগুজে শ্যাম্পু-করা চুল পিঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে হাই হিলে খুটখুট করে শরীর নাচিয়ে স্কুলে পথ দিয়েছিলেন। আমার পাইপের মাঝখানে একটা ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে পানি পিচকিরির বেগে বেরিয়ে এসে বারান্দার এক অংশ ভালোরকম ভিজিয়ে দিয়েছিল। ভদ্রমহিলা হাই হিল পায়ে সেই অংশটি পার হওয়ার সময় তাঁর পায়ের জুতো তাঁকে প্রতারিত করল। পিচ্ছিল সিমেন্টের ফ্লোরে ডান পা-টি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাম পা-টি স্থানচ্যুত হয়ে গেল। মহিলা একেবারে কাটা কলাগাছের মতো সটান চিত হয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন, সেটা বড় কথা নয়, মহিলার শাড়ি, পেটিকোট সব শরীরের ওপর চলে এসেছিল। সে সময়ে আমাকে ভেতরের অংশ দেখতে হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা। আমিই মহিলাকে পতনদশা থেকে টেনে তুলে ঘরে রেখে আসি। সেদিন ভদ্রমহিলার আর পড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাটি তাঁর স্বামী স্ট্যাটিসটিকসের লেকচারার নূরুল হককে ভীষণ তাতিয়ে তুলেছিল। অনেক কষ্ট করে তাঁকে বোঝাতে পেরেছি, আসলে এটা একটা দুর্ঘটনা। তার পেছনে আমার কোনো মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। নূরুল হক যদি বাগড়া দিতেন আমার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচিটি সেদিনই বন্ধ হয়ে যেত।

সেই সকালেই কোয়েল, নীনু ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ানো চারাগুলো দেখে আমার ঘরে এল। কোয়েল বলল, কী মজার, চারাগুলো খাড়া হয়ে গেছে। এই কোয়েল ছেলেটার ভেতরে গাছের মতো সরল কিছু পদার্থ আছে। তার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে একটা চাপা আবেগ ঝরে পড়ছে। সে বলল, মামা আপনার অনেক টাকা তো বেরিয়ে গেল। গাছগুলোতে বেগুন ধরলে আপনি কটাকাই বা পাবেন! সারাবছরে আপনি কত বেগুন খাবেন। আমি বললাম, বেগুন খাব না, এই সিজনে চুটিয়ে বেগুনের ব্যবসা লাগিয়ে দেব। কোয়েল বলল, এই কটা চারার বেগুন দিয়ে কী ব্যবসা হবে। আমি বললাম, কোয়েল তুমি এই চারাকটাকেই দেখছ কেন। সামনের সমস্ত মাঠটা চষে আমরা বেগুনের চাষ করব। কোয়েল বলল, না মামা সেটা সম্ভব নয়। আমি জানতে চাইলাম, কেন সম্ভব নয়। সে বলল, হাল, লাঙল, গরু ওসব আপনি পাবেন কোথায়? আমি বললাম, হাল লাঙলের দরকার নেই, আমরা খুঁড়ে সমস্ত মাঠটা আবাদ করে ফেলব। তা হলে মামা আপনাকে কোদাল, খুরপি, ঝাঁজরি, গোবর, সার কতকিছু কিনতে হবে। চাষবাসের কাজ আপনার বই লেখার মতো অত সহজ নয়। বেশ কঠিন। আমি বললাম আমি চাষার ছাওয়াল। কোয়েল বলল আপনি চাষার ছাওয়াল হতে পারেন, কিন্তু নিজে

হাতেকলমে কখনো চাষ করেননি। আমি বললাম, সে পরে দেখা যাবে। আগে চলো নিউমার্কেটে গিয়ে কোদাল খুরপি এসব কিনে নিয়ে আসি।

কোদাল কিনলাম, খুরপি কিনলাম, ঝাঁজরি কিনলাম, চাষের জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিনে ফেললাম। বিস্তর টাকা বেরিয়ে গেল। কোদাল এবং খুরপি কিনে একটা বিপদে পড়ে গেলাম। বাজারে আস্ত নতুন কোদাল খুরপি এসব কিনতে যাওয়া যায় বটে, দোকানদাররা কেউ হাতল বেচে না। হাতল ছাড়া খুরপি কোদাল ওগুলোর মূল্য কী? হাতল কোথায় পাওয়া যায়, সেটা আমাদের কাছে রীতিমতো এক শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কিছুর ওপর গবেষণা করা হয়, কিন্তু কোদাল খুরপির হাতল কোথায় পাওয়া যায়, হদিস আমাদের কেউ দিতে পারল না। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতে হোস্টেলের পিয়ন আলি আকবর এসে একটা প্রস্তাব দিল। ঢাকা শহরে তার এক ভায়রাভাই থাকেন। তিনি জুরাইনের দিকে চাষবাস করেন। তাঁর কাছে চাষবাসের অনেক যন্ত্রপাতি সব সময় মজুত থাকে। আমি যদি আলি আকবরকে একশো টাকা দিই সে জুরাইনে তার ভায়রাভাইকে দিয়ে কোদাল ও খুরপিতে নতুন হাতল লাগিয়ে আনবে। অগত্যা কী করা। একশো টাকা ছাড়তে হল। আলি আকবর এক ছুটির দিনে কোদাল খুরপি নিয়ে জুরাইনে তার ভায়রাভায়ের কাছে গেল। শনিবার সকালে নতুন হাতল লাগানো খুরপি কোদাল দুটি নিয়ে হাজির হল। এই যন্ত্র দুটি পেয়ে আমার ইচ্ছে হল, এক্ষুনি মাঠে নেমে পড়ি। কোদাল কেনার পর থেকে মাঠটা বুক চিতিয়ে ডাকছে, আসো আমাকে খুঁড়তে থাকো। আমার এমন ভাগ্য সেদিনই আকাশের চারকোণ হয়ে জমাট মেঘ করল এবং একটু পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

তার পরের দিনও মাঠে নামা সম্ভব হল না। পানি জমে সারা মাঠ থকথকে হয়ে গেছে। কোদালে কোপ বসানো যায় না। মাঠ শুকিয়ে এলে আমরা খুঁড়তে লেগে গেলাম। একটা বাধা এল। হোস্টেলের ওয়ার্ডেন আকাদ্দস আলি সাহেব জানালেন, মাঠ খুঁড়ে চাষ করা একটা বেআইনি কাজ, কেননা যে জায়গা খুঁড়ব বলে ঠিক করেছি, সেটা আসলে একটা ভলিবল খেলার মাঠ। গত পাঁচ বছর কোনো কেউ ভলিবল খেলেনি বটে, তবে যে-কোনো বোর্ডার ইচ্ছে করলে তো আবার খেলা শুরু করে দিতে পারেন। তখন উপায়? আমি বললাম, গত পাঁচ বছর যেমন কেউ খেলা শুরু করেনি, এবছরও শুরু করবে না। সুতরাং আমাদের মাঠ খুঁড়তে দিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তিনি বললেন, এর মধ্যে একটা আইনকানুনের ব্যাপার আছে না, ভলিবলের মাঠে ক্ষেত করলে কেমন জানি দেখায়, ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব শুনলে কী মনে করবেন? আমি বললাম, আপনি ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে বলুন গিয়ে আমাকে একটা কাজ দিতে। আমার করার মতো কিছু নেই বলেই চাষ করার ব্যাপারটি বেছে নিয়েছি। তিনি হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, আপনি দেখছি আমাকে মুশকিলে ফেলবেন। তারপর চলে গেলেন।

আমি কোয়েল নীনু মাঠ খুঁড়তে যাওয়ার আগে বাইরের হোটেলে গিয়ে ভালো করে নাশতা খেয়ে এলাম। আমি বললাম, ভালো করে খাও, মাঠ খুঁড়তে গেলে অনেক শক্তির দরকার। আমি মাঠে এসে কোদালের প্রথম কোপটা বসিয়ে অনুভব করলাম, হাঁফ ধরে যাচ্ছে। আট দশটা কোপ দিয়ে বসে পড়তে হল। কোয়েল বলল, আমি বলেছি না মামা আপনি চাষের কিছু জানেন না। এরকম করে কেউ কোদাল ধরে নাকি। এই দিকে দিন

দেখিয়ে দিই। সে কোদাল নিয়ে ছোট কোপ বসিয়ে আট-দশহাত খুঁড়ে ফেলল। আরেকটা উপসর্গ দেখা দিল। কোদালের কোপের সঙ্গে বড় বড় কেঁচো বেরিয়ে এসে লাফাতে লাগল। কোনো কোনোটা দু টুকরোও হয়ে গেল। নীনু এই কেঁচোর গুষ্টি দেখে ওয়াক ওয়াক বমি করতে থাকল। কেঁচো জিনিসটি আমিও পছন্দ করিনে। বুকে-হাঁটা যে-কোনো জীব দেখলেই আমার শরীরটা ভারী হয়ে আসে। আমি বললাম, আজ থাকুক, মাঠ আরো শুকোলে খোঁড়া যাবে।

আমরা স্থির করলাম, মাটি খোঁড়া আজ এ পর্যন্তই। কোয়েল আমার কথায় রাজি হল না। সে বলল মামা আমি আরো কিছুক্ষণ কোদাল চালিয়ে যেতে চাই। জিগগেস করলাম, হয়রান লাগছে না? কোয়েল জবাব দিল, খুব লাগছে মামা। কিন্তু চাষা হয়ে ওঠার একটা আনন্দ আছে। আমি যে মাটিটা কোপাচ্ছি, সেই মাটিটাই ফলে ফসলে ভরে উঠবে, ভাবতে বেশ লাগছে। নিজের শরীরের মেহনতের একটা মূল্য আছে, আর কোনো কাজে এমন অনুভব করা যায় না। তা ছাড়া আরেকটা কথা মামা, কোদালের কোপে ভেতরের লালচে মাটি যখন উঠে আসে, আমার ভেতরে কী যে ঘটে যায় বলা যাবে না, এত ভালো লাগে। আমি বললাম, হঠাৎ চাষা হয়ে ওঠার আনন্দে মাটি কোপাতে থাকলে হাতে ফোসকা পড়ে যাবে। কাল আর মাটি খুঁড়তে পারব না। কোয়েল বলল, মামা আপনি আছেন কোথায়? ফোসকা পড়তে বাকি আছে নাকি? হাসতে হাসতে মেলে দেখাল সে হাত দুটো। আমি দেখলাম বাম হাতে একটা এবং ডানহাতে দুটো টসটসে ফোসকা জেগে উঠেছে। বললাম, ঠিক আছে, আজ খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বন্ধ রাখো। ফোসকা যখন পড়ে গেছে তোমার চাষা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

মৌলবি কুদ্দুস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ দেখছিলেন। কাজ বন্ধ করে আমরা যখন মাঠ থেকে উঠে আসছি, তিনি হঠাৎ করে জিগগেস করে বসলেন, এরই মধ্যে আপনাদের কাজ শেষ? আমি বললাম, আজকের মতো শেষ। মৌলবি বললেন, তিনজনে মিলে কহাত মাটি খুঁড়েছেন হিসেব করে দেখেন, আপনাদের শরমিন্দা হওয়া উচিত। নীনু বলল, চাচা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় কথা বলা যায়। একবার কোদাল ধরে দেখুন তখন বুঝবেন, কী কষ্ট। মৌলবি বললেন, আমি তোমাদের কোদাল ধরে দেখাব, মাটি কীভাবে খুঁড়তে হয়। একটু দাঁড়াও আমি পাজামাটা ছেড়ে আসি।

মৌলবির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ দেখে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়ল। তা হলে কুদ্দুসের সবটা মৌলবি নয়, ভেতরে অন্য মালও আছে। কুদ্দুসের পরিচয়টা একটু দিতে হয়। কুদ্দুস মাদ্রাসা পাশ মৌলবি নন। সব সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং মাথায় গোলটুপি পরে থাকেন বলেই সকলে তাঁকে মৌলবি ডাকে। থুতনির আগায় অল্প অল্প দাড়ি তাঁর এই মৌলবি পরিচয়ের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরে। কুদ্দুস পাশ করেছিলেন স্ট্যাটিসটিকস বিভাগে। কোন সালে খুব সম্ভবত কুদ্দুস নিজেও সেটা ভুলে গেছেন। কুদ্দুস হোস্টেলে থাকতে এসেছেন আমার অনেক পরে। তাঁর শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মাথায় গোলটুপি দেখে দেখে আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে, আমার জন্মের পর থেকেই কুদ্দুসকে এই পোশাকে দেখে আসছি। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় কুদ্দুস এই পাজামা-পাঞ্জাবি এবং গোলটুপিসহ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। কুদ্দুসের দুটি

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি
শাহবাগ, ঢাকা।

ধনুক-ভাঙা পণের কথা আমরা সকলেই জানি। প্রথমটি হল কুদ্দুস স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসরের চাকুরির জন্য অপেক্ষা করবেন। লেকচারার পোস্টে ডাকা হলেও যাবেন না। কারণ ডক্টরেট পেতে তাঁকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর থেকে শুরু করলেই এই এতগুলো বছর পুষিয়ে নিতে পারেন। তাঁর দ্বিতীয় পণটি ডাক্তার ছাড়া অন্য কোনো পেশার মেয়েকে বিয়েই করবেন না। কুদ্দুসকে সাধারণত আমরা মিথ্যে বলতে দেখিনি। আর অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত মুহূর্তটিতেও একটি খারাপ কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুনিনি। আমাদের কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে আল্লাহ্‌তালা কুদ্দুসের উভয় দাবিই পূরণ করবেন। বিশ্বাস করতে দোষ কোথায়। কবর আজাব, হাশর নশর কত কিছুই তো আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। কুদ্দুস সকালবেলা মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে মর্নিং ওয়াক করতে যান। ফিরে এসে নাশতার টেবিলে রিটায়ার্ড জজ, সেক্রেটারি এরকম উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে গল্প করেন। মাটি কেমন করে খুঁড়তে হয় দেখিয়ে দেবেন; তাঁর মুখ থেকে এই ধরনের একটা হুমকি শোনার পর থেকে মৌলবি কুদ্দুসের চরিত্রের একটা নতুন দিক দর্শন করার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম।

মৌলবি কুদ্দুস লুঙ্গি পরে এলেন। মাঠে এসে কাঁধের ঝুলানো গামছাটা কোমরে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিলেন। লুঙ্গিটা মালকোঁচা করে ওপরে তুলতে তুলতে লজ্জাস্থানের গোড়া অবদি নিয়ে গেলেন। তারপরে বাঁকা হয়ে প্রথম কোপটা দিলেন। প্রথম কোপ দেখেই আমরা বুঝে গেলাম, এই কাজে কুদ্দুস অত্যন্ত কামেল ব্যক্তি। তিনি এমনভাবে ছোট বড় মাঝারি যখন যেখানে যেটা মানানসই কোপ দিয়ে নিপুণভাবে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছিলেন, দেখলে যে-কেউ মনে করবে জন্মের পর থেকে কুদ্দুস মাটি খোঁড়ার কাজটিই করে আসছেন। প্রায় আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা তিনজনে যতদূর খুঁড়েছি, কুদ্দুস একা তার তিনগুণ মাটি খুঁড়ে ফেলেছেন। কোদালের হাতলটা ছেড়ে দিয়ে কোমরের গামছা খুলে গায়ের ঘাম মুছে নিলেন। তারপর বললেন, মাটি কেমন করে খুঁড়তে হয় শিখিয়ে দিলাম। তারপর গর্বভরে কতদূর কুপিয়েছেন, সেদিকে তাকালেন। কোয়েল বলল, কুদ্দুস চাচা এতদিনে জানতে পারলাম, আপনার পাঞ্জাবি এবং টুপি এইসবের ভেতর একজন চাষা আত্মগোপন করে অপেক্ষা করছিল। সেই চাষাটিই আজ সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। কুদ্দুস কোয়েলের কথাটি বিশেষ পছন্দ করেননি মনে হল। আমাদেরকে মাঠের গোড়ায় রেখেই আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বলে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন।

মাঠ খোঁড়ার কাজে আমাদের অনেক সময় লেগে যেত। সৌভাগ্যবশত ছিন্ন-সম্পর্ক অনেক ছদ্মবেশী চাষার সঙ্গে আমাদের মুলাকাত ঘটে গেল। আমরা যখন দুবেলা নিয়ম করে মাটি খুঁড়তাম, জুতো-মোজা-পাতলুন-শার্ট পরা অনেক ছদ্মবেশী চাষা আমাদের মাটি খোঁড়া দেখতে ভিড় করে দাঁড়াত। এটা একটা মজার খেলা মনে করে আমাদের হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকত। এই মাটি খোঁড়ার খেলায় যারা অংশ নিতে চাইত, তাদের যাতে সুযোগ দেয়া যায়, সেজন্য আরো দুটি কোদাল কিনতে হল এবং হাতল লাগাবার জন্য আরো দুবার আলি আকবরের ভায়রাভায়ের মুখাপেক্ষী হতে হল। আট-দশদিনের মধ্যে সারা মাঠের তিনভাগের দুভাগ খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে

গেল। যারা খুঁড়ে দিয়ে গেল তাদের অনেকেরই নাম পরিচয়ও আমাদের জানা হয়নি। আমরা চাষা হওয়ার খেলাটা শুরু করেছিলাম মাত্র। কোনোরকমের আহ্বান এবং প্রণোদনা ছাড়াই হলের ছাত্রেরা অবচেতন আবেগের নির্দেশে আমাদের খোঁড়াখুঁড়ি কর্মে অংশগ্রহণ করে পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছে।

জমি খোঁড়ার কাজ তো একরকম সারা। এখন চারা লাগাবার সময়। শাহানা এবং হাবিব বলল, জমি তো একরকম তৈরি, এখন আপনি সয়েল সায়েন্স কিংবা বোটানি ডিপার্টমেন্টের কাউকে ডেকে পরামর্শ গ্রহণ করুন। এই মাটিতে কোন ফসল ফলবে তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। প্রস্তাবটা নিয়ে আমি, নীনু এবং কোয়েল আলোচনা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত নাকচ করে দিলাম। আমরা সকলেই আনাড়ি চাষা। একজন বোটানিস্ট কিংবা সয়েল সায়েন্টিস্টের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করলে আমাদের আনন্দটাই মাঠে মারা যায়। তার বদলে ঢাকা কলেজের পাশের যে-লোকটির কাছে চারা কিনে থাকি তাঁকে ডেকে পরামর্শ নেব স্থির করলাম।

আমি এরই মধ্যে আনসার আলিকে দুপুরে আমার সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলাম। আনসার আলি প্রথমে রাজি হতে চাননি। দুপুরবেলাটাতেই তাঁর যা কিছু বেচাকেনা। একবেলা খাওয়ার লোভে যদি আমার সঙ্গে আসেন, তাঁর একদিনের বিজনেস মার খাবে। আমার সঙ্গে আনসার আলির ভালোরকম জান পহচান হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যত সে কারণেই আনসার আলি দুপুরের বিজনেস বাদ দিয়ে আমার কাছে এলেন।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর আনসার আলিকে হোস্টেলের সামনের মাঠটা দেখালাম। আনসার আলির চোখজোড়া কপালে ঠেকে গেল। আরে সাব একখান জব্বর কাম কইরা ফেলাইছেন। এই এতখানি জমিন কোদাল দিয়া কোপাইয়া খুঁড়ছেন কী সাংঘাতিক কথা। আনসার আলি কোপানো জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে মাটির ঢেলার ওপর লাথি দিয়ে দেখলেন গুঁড়ো হয় কি না। তারপর ছোট ছোট ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। মুখের ভেতর আরেকটা পান ঠেসে দিয়ে বললেন, খুব ভালা জাতের মাটি। এই মাটি সব ফসলের উপযুক্ত। আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ যা লাগাইবেন হলপল কইর‍্যা বাইর‍্যা উঠব। আনসার আলি পানের পিক ফেলে বললেন, কথা অইল অহনও মাটি ভিজা আছে। একটু হুকাইবার দেন। দুই চারদিন রইদ খাইয়া মাটি একেবারে ঝুরঝুরা অইয়া উঠব। তহন হুকনা গোবরের লগে ফসফেট মিশাইয়া ছড়াইয়া দিবেন। তারও দুই চাইর দিন গেলে চারা লাগাইবেন। কিন্তু আমার একখান কথা আছে। হেইডা বলি। আপনের মাথায় তো কিরা ঢুকছে, বেগুন ছাড়া আর কিছু লাগাইবেন না। আপনের হাউস অইছে এক অংশে বেগুন লাগান। বাকি অংশে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, মরিচ এইসব লাগান। নানান জাতের ফসল যহন ক্ষেতে মাথা তুলব আপনের নিজের চউকেও তহন ভালা লাগব।

আরেকখান কাজের কথা বলি। পশ্চিম পাশে যেই জমিটা অহনও খোঁড়েন নাই রাইখ্যা দেন। মাঝখানে মাঝখানে থালি কইর‍্যা এক পাশে জালি লাউ আর এক পাশে মিষ্টি কুমোড়ের চারা লাগাইয়া দেন। চারার লাইগ্যা আপনের ভাবনা করতে অইব না, যেই জিনিসের চারা চাইবেন, আমি আইন্যা দিব।

আমাদের এখন ভাবনা হয়ে দাঁড়াল শুকনো গোবর কোথায় পাওয়া যায়। আবার আলি আকবরের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তার জুরাইননিবাসী বিখ্যাত ভায়রাভাই যদি আমাদের চার বস্তা শুকনো গোবর সংগ্রহ করার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারেন। শুধু সুসংবাদটি নিয়ে আসার জন্য আবারও আলি আকবরকে যাওয়া-আসার খরচ বাবদ নগদ সত্তর টাকা দিতে হল। আলি আকবর তখন আমাদের গোবরের সংবাদটি এনে দিতে পারল না। আমাদের বিষ্যুদবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। কারণ ওই দিনটিই সপ্তাহের শেষ। বাকি ছয়দিন তাকে অফিস করতে হয়। বিষ্যুদবার সন্ধেবেলা আলি আকবর তার ভায়রাভায়ের বাড়িতে যায়। সারা শুক্রবারটা আমাদের অধীর আগ্রহে আলি আকবরের জন্য প্রতীক্ষা করতে হল। শুক্রবারে সে এল না। শনিবার বেলা সাড়ে নটার সময় আলি আকবর হেলতে দুলতে পান চিবোতে চিবোতে উদয় হল। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। জিগগেস করলাম, আলি আকবর তোমার এত দেরি হল কেন? সে অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল, স্যার কুটুমবাড়িতে গেলে অত তাড়াতাড়ি আসা যায় নাকি। দেশ থেকে আমার শাশুড়ি আর জেঠাস এসেছে। অফিসের ডিউটি না থাকলে আজও আসতাম না। আমি বললাম, শুকনো গোবরের কোনো সন্ধান পেলে? তোমার ভায়রাভাই কী বলল? আলি আকবর জানাল তার ভায়রা-ভায়ের দুটো গোবরগাদা ছিল ঠিকই কিন্তু হঠাৎ টাকার দরকার হওয়ায় সে দুটো তাকে বেচে দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, তবে একটা খবর আছে। বস্তাপ্রতি পঁচাশি টাকা দিতে যদি রাজি থাকি, তার ভায়রাভাই জুরাইন থেকেই গোবর সংগ্রহ করে দিতে পারে। আমি দেখলাম একটা গ্যাঁড়াকলের মধ্যে পড়ে গেছি। অগত্যা ফি বস্তা শুকনো গোবরের জন্য পঁচাশি টাকা কবুল না করে উপায় কী।

আমি আলি আকবরের কাছে জানতে চাইলাম, অতদূর থেকে গোবর আনবে কেমন করে? রিকশা করে কি সম্ভব? আলি আকবর বলল, স্যার কত বস্তা গোবর আপনার প্রয়োজন? আমি বললাম, ধরো তিন বস্তা। সে বলল, তিন বস্তা রিকশাতে ধরবে না, ঠেলা লাগবে। বললাম, ঠেলাতে কত লাগতে পারে? আলি আকবর বলল, জুরাইন থেকে নীলক্ষেত কম দূরের পথ না, ঠেলাঅলার পুরা আধা দিন লেগে যাবে। আমি ঠিক জানিনে, মনে হয় আড়াইশো টাকা দাবি করতে পারে। আমি মনে মনে সর্বমোট কত টাকা হয় হিসেব করে নিলাম। তিন পঁচাশিতে হয় দুশো পঞ্চান্ন টাকা, তার সঙ্গে আড়াইশো যোগ করলে দাঁড়ায় পাঁচশো পাঁচ টাকা। আমি বললাম, ঠিক আছে আলি আকবর তোমাকে আমি নগদ পাঁচশো ষাট টাকা দিয়ে দেব, দয়া করে গোবর তিন বস্তা এনে দাও। আলি আকবর জানাল, স্যার আমি পারব না। আমাকে নরম হতে হল। বললাম, কেন পারবে না বাবা? সে বলল, গোবর এবং ঠেলার পেছনেই তো আপনার পাঁচশো ষাট টাকা চলে যাবে। আমার খরচ কোথায়? সে বলল, আমার যাওয়া-আসার খরচ এবং এই যে একটা দিন নষ্ট হবে তার কি কোনো দাম নেই? দেখলাম আলি আকবরের হিসেব-জ্ঞানটি টনটনে। আমি বললাম, তোমাকে কত দিতে হবে তাও বলে দাও। সে মাটির দিকে দৃষ্টি নত করে বলল, আপনি আমাকে মোট দেড়শো টাকা দেবেন স্যার। নইলে আমার যাওয়া-আসার পরতা পড়বে না। হিসেব করলাম পাঁচশো ষাট আর দেড়শোতে কত হয়, সাতশো টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেগুন চাষের মজা এখন

থেকে বুঝতে পারছি। তেতো ওষুধ গেলার মতো করে বললাম, ঠিক আছে আলি আকবর তোমাকে ওই সাতশো পাঁচ টাকাই সব মিলিয়ে দেব, আগামীকাল তুমি আমাকে তিন বস্তা গোবর এনে দাও। বাক্স খুলে টাকাটা আলি আকবরের হাতে দিলাম। তার ভাবেভঙ্গিতে মনে হল নেহায়েত আমাকে কৃতার্থ করার জন্যই টাকাটা গ্রহণ করেছে। আমি বললাম, তোমার সব দাবিই তো মেনে নিলাম, এখন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোবর তিন বস্তা এনে দাও। আলি আকবর বুড়ো আঙুলটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আগামীকাল তো পারব না স্যার, আমার অফিস আছে না। আমার ইচ্ছে হল তার পাছায় একটা লাথি বসিয়ে দিই। আমি লাথি বসাতে পারি। তাই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীমহলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। রাগ ঝাল ক্ষোভ সব হজম করে নিলাম। আমার শিক্ষা হচ্ছে, শখের বেগুন চাষিকে অনেক কিছু হজম করতে হয়। বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, আলি আকবর তুমি কবে গোবরটা আনতে পারবে দিনটা ঠিক করে বলো। সে বলল স্যার শনিবারের আগে না। বিষ্যুদবার অফিসছুটির পর জুড়াইনে ভায়রাভায়ের বাড়িতে যাব। আপনাকে তো বলেছি স্যার, দেশ থেকে আমার জেঠাস এবং শাশুড়ি এসেছে, সুতরাং শুক্রবারটা সেখানে থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছে শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ আপনার গোবর ঠেলাতে করে এখানে নিয়ে আসব। পথে যদি যানজট বেশি হয় কিংবা পলিটিক্যাল পার্টির মিছিল থাকে, তা হলে আরো একটু বেলা হতে পারে। অবশ্য আমি কালাম সাহেবকে বলে যাব, শনিবার আমার অফিসে আসতে একটু দেরি হবে। ফাটা বাঁশের মধ্যে অণ্ডকোষ আটকে গেলে যে দশা হয় আলি আকবর আমাকে সে অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। তার সবগুলো শর্ত পরম অনিচ্ছেয় আমাকে কবুল করে নিতে হল।

একসময়ে সত্যি সত্যি জুরাইন থেকে ঠেলাভরতি গোবর আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের মাঠের গোড়ায় এল। সেই দিনটাকেই আমরা উৎসবের দিন বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমি, নীনু, কোয়েল বস্তাগুলো পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ঠেলা থেকে নামিয়ে কোপানো জমিটার কাছে নিয়ে এলাম। বস্তা খুলে গোবর এক জায়গায় জড়ো করে দুহাত দিয়ে কচলে কচলে চাকাগুলো ভেঙে মিহি করে নিলাম। এই গোবরের চাকা গুঁড়ো করতে গিয়ে গুবরেপোকার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। শাদা চিংড়িমাছের মতো অজস্র পোকা এই গোবরের সঙ্গে মিশে রয়েছে। নীনু বলল, মামা চলুন এক কাজ করে দেখি। আমরা তো সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি, চলুন এই গুবরেপোকাগুলোকে ভাজা করে খেয়ে দেখি। দেখতে তো খারাপ লাগে না। আরেকটু লম্বা হলেই গলদা চিংড়ির আকার পেয়ে যেত। তার মা শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ দেখছিল। পুত্রের গুবরেপোকা-প্রীতির কথা শুনে তার মেজাজ চড়ে গেল। শাহানা নীনুর গালে ছোট করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, আজ তোমাকে আমি ঘরে ঢুকতে দেব না। ছফা ভাই আমার ছেলেদের কীসব উলটাপালটা জিনিস শেখাচ্ছেন!

ওই একই দিন সন্ধেবেলা আমরা গোবরের সঙ্গে ফসফেট এবং ইউরিয়া মিশিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দিলাম। এই কাজটি করার পর তিনজনে মিলেই ঢাকা কলেজের সামনের চারাবিক্রেতা বন্ধু আনসার সাহেবকে গিয়ে ধরলাম। আপনার কথামতো গোবরের সঙ্গে ফসফেট এবং ইউরিয়া মিলিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছি। আর মাঠও শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে

গেছে। আর দেরি করা যায় না। সিজন চলে যাবে। আগামীকালকেই সবগুলো চারা লাগিয়ে দেব। আনসার আলি পানের বোঁটায় কামড় বসিয়ে চুনটা মুখে ঢুকিয়ে বললেন, মাটিতে গোবর আর ফসফেট দিছেন, তাতে কী অইছে। এইগুলান মাটির সঙ্গে মিশা যাইবার সময় দিবেন না। যান আরেকবার মাটি কোপাইয়া দেন। তারপর দুই দিন সবুর করেন। আজকে অইল আপনের মঙ্গলবার। শুক্রবার বাদ জুমা আপনেরা মাঠে চারা লাগাইবেন। জুমার নামাজের পর চারা লাগাইলে ক্ষেতে পোকামাকড়ের উৎপাত কম অয়। বুইঝলেননি ছোড ভাই, শুক্রবার অইল আল্লার দিন। কোয়েল বলল, আনসার সাহেব আপনি কেবল দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করলে কবেই আমরা ক্ষেতে চারা রোপার কাজ শেষ করে দিতাম। এই এতদিনে বেগুন গাছে ফুল এসে যেত। আনসার আলি কোয়েলের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, ছোড ভাই তোমার ধইরয এক্কেরে নাই। ধইরয না থাইকলে কি চাষা অন যায়। চাষ করা আর এবাদত করা সমান। আপনে গাছ চারা লাগাইবার মালিক, কিন্তু ফল দেওনের মালিক আল্লাহ্ গফুরুর রহিম।

শুক্রবারে চারা লাগানো শুরু করার পূর্বে আপনাআপনি একটা উৎসব জমে গেল। আমরা কাউকে ডাকিনি। অথচ অনেক মানুষ এসে আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের অনেককেই আমরা চিনিনে। চারা লাগাবার একটি আলাদা আনন্দ আছে। মানুষ হয়তো সচেতনভাবে বুঝতে পারে না, কিন্তু অবচেতনে একটা অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে। চারা লাগানোর মধ্যে যে একটা অমল আনন্দ আছে, তার কারণ বোধ করি ওই যে তার সঙ্গে অমরতার একটা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত থাকে। প্রকৃত কৃষক যেমনভাবে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করতে আসা বেগার দেয়া লোকদের আপ্যায়ন করে, আমাদেরও সেরকম সামান্য খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতে হল। মুড়ি আনা হল, মোয়া আনা হল, নারকোল কুরিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতে হল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মাঠটিতে চাষাবাদ করার মতো একটা মহৎ কাজের আয়োজন করতে যাচ্ছি। সংবাদ শুনে যাঁরা স্বেচ্ছায় সাহায্য দিতে ছুটে এসেছেন, তাঁদের খালিমুখে বিদেয় করি কেমনে। চাষা হওয়ার পূর্বেই আমাদের কৃষক সংস্কৃতি জন্ম নিতে আরম্ভ করেছে। যাঁরা চাষের কাজে হাত লাগিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মুখে যদি কিছু দানাপানি না পড়ে, তা হলে ক্ষেতের ফসলের অকল্যাণ হতে পারে।

আমরা চার কাঠা পরিমাণ ভূমি খুঁড়েছিলাম। লাঙল বলদ কিংবা ট্রাক্টরের সাহায্য ছাড়া এই পরিমাণ জমি কোদাল দিয়ে খুঁড়ে চাষযোগ্য করা রীতিমতো সংবাদপত্রে স্থান পাওয়ার মতো একটি ঘটনা। দুটি কোদালই ছিল আমাদের সম্বল। বাকি অংশ যারা এসে খুঁড়ে দিয়ে গেছে, তাদের মাত্র দুয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় আছে, বাকিদের চিনিনে। বিনা আমন্ত্রণে জমি খুঁড়ে দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে কোনোদিন ফসলের সামান্য অংশও দাবি করবে না। যদিও ক্ষেতটা আমাদের, তবু অবচেতন মনে আমরা অনুভব করছিলাম এই ক্ষেতে অনেকেরই দাবি রয়েছে। যাহোক-চার কাঠা জমির দু-কাঠাতে বেগুনের চারাই লাগালাম। আনসার আলির মতে এটা বাড়াবাড়ি। টম্যাটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ সবকিছু মিলমতো লাগালে বেগুনের জন্য দুকাঠা বরাদ্দ করা পক্ষপাতের মতো দেখায়। আমি বেগুনের প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে পারি কেমন করে।

শাহবাগের রাস্তার ওপর থেঁতলে-যাওয়া বেগুনের চারাটিই তো আমাকে এই চাষের কাজে নামিয়েছে। বাকি দুকাঠা জমি চার ভাগে ভাগ করে নিলাম। এক অংশে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো অন্য অংশে মরিচ এবং বাকি অংশটিতে পেঁয়াজ লাগালাম। আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচির একটা পর্ব এখানে শেষ হল।

নীনু এবং কোয়েল বারবার তাগাদা দিচ্ছিল। এ পর্যন্ত আমরা আনসার আলির সমস্ত পরামর্শ মেনে আসছি। তিনি তো বলেছেন, মাঠের পশ্চিমদিকে থালি করে মিষ্টি কুমোড় এবং জালি লাউয়ের চারা লাগাতে। আমি একটু দোনোমনো করছিলাম। বাকি মাঠটার পরিমাণও চার কাঠার কম হবে না। এই আট কাঠার ক্ষেত আমরা সামলাতে পারব কি না। কিন্তু ছেলে দুটো নাছোড়বান্দা। তাদের যুক্তি ওই একটাই। আমরা যখন চাষ করতে শুরু করেছি ওই জমিটা এমন নাবাল পড়ে থাকবে কেন। আমি ভেবে দেখলাম, তারা নেহাত অন্যায় কিছু বলছে না। আমারও অনাবাদি জমি পড়ে থাকতে দেখলে বন্ধ্যা নারীর কথা মনে হয়। আমরা মাঠে থালি খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। এখন মাটি অনেক শুকিয়ে এসেছে। খুঁড়তে সুবিধে। দুদিনের মধ্যেই আমরা গোটা মাঠটার মধ্যে থালি কেটে ফেললাম। কাজ যখন শেষ হল নীনু-কোয়েলকে বললাম, যাও আনসার আলিকে বলে জালি লাউ এবং মিষ্টি কুমোড়ের বীজ নিয়ে এসো। নীনু ভুরু কুঁচকে বলল, বীজ নয় চারা লাগাতে চাই। বীজ জন্মাবে, তারপর চারা হবে, অনেক সময় লেগে যাবে। একেবারে চারা এনে লাগালে ঝুটঝামেলা থাকবে না। আমি বললাম, আনসার আলি জালি লাউ এবং মিষ্টি কুমোড়ের চারা তো বেচেন না, আমি তাঁকে বীজই বেচতে দেখেছি। কোয়েল বলল, আনসার সাহেবকে যেখান থেকেই হোক চারা জোগাড় করে দিতে হবে, নইলে তাঁর অ্যাগ্রিকালচারাল কনসালটেন্টের চাকরিটি থাকবে না। দুদিনের মধ্যে নীনু কোয়েল আনসার আলিকে দিয়ে লাউ এবং মিষ্টি কুমড়োর চারা জোগাড় করিয়ে ছাড়ল।

চারা রোপার তো কাজ সারা। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে গরু-ছাগল যে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় সেই জিনিসটি আমরা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনিনি। আমরা চারা লাগালে সেগুলো গরু-ছাগল আদর করে ভক্ষণ করতে ছুটে আসবে, আমরা চিন্তাও করতে পারিনি। কাঁটাতারের বেড়ার এখানে ওখানে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেই বড় বড় ফাঁকগুলো দিয়ে গরু-ছাগল এসে বারেবারে হামলা করতে লাগল। গরু-ছাগলকে দোষ দিয়েও কী লাভ। এত সুন্দর বাড়ন্ত ক্ষেত থাকতে কোন দুঃখে তারা মাঠের শুকনো ঘাসের গোড়ায় কামড় বসাবে। একবার পাটকিলে রঙের একটা গাই এসে টপাটপ বিশ পঁচিশটা বেগুনের চারা শেকড়সুদ্ধ টেনে তুলে মুখ-গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য করে ফেলল। গরুটি এমন বেহায়া বেআক্কেল যে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেয়ার পরও দেখা গেল ক্ষেতের মায়া কাটাতে পারছে না। বুঝলাম আমাদের ক্ষেতের চারাগুলো এই অর্ধভুক্ত স্ত্রীজাতীয়া পশুটির কাছে পরম উপভোগ্য এবং মিষ্টি লেগেছে। তাড়িয়ে শাহবাগের গোড়ায় পাঠিয়ে দিলেও গাভীটির লোভ দমন করার কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে না পেরে অনেক কষ্টে ধরে ফেলে লিচু গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। সন্ধেবেলা বস্তি থেকে মালিক কাকুতিমিনতি করে গরুটি নিতে এলে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়ে বলা হল, ফের যদি গরুটি আসে, হাটে চালান হয়ে যাবে। মালিক

গরুর টিকিও দেখতে পাবে না। ওই পাটকিলে রঙের গাভীটিই একমাত্র পশু নয়। আরো অনেক গরু মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তার অনেকগুলো মোটা তাজা শিঙাল এবং ষণ্ডা চেহারার। তাড়াতে গেলে তেড়ে এসে কখন শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেবে সেই ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়।

অগত্যা আমাদের কাঁটাতারের বেড়ায় ফাঁকগুলো বন্ধ করার কথা চিন্তা করতে হল। দেয়ালঘেঁষা বরইগাছের মাথাটা কেটে ফেললাম। ছোট ছোট কাঁটাঅলা ডালগুলো ফাঁকের মধ্যে বসিয়ে দিলাম। এইখানে আমরা সামান্য বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারলাম। বড় বড় ডালগুলো আমরা নাড়াচাড়া করে গাছের তলাতে রেখে দিলাম। এইগুলোর যখন পাতা ঝরে যাবে এবং শুকিয়ে হালকা হবে জালি লাউয়ের সুন্দর জাঙলা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যাহোক, গরুর উৎপাত বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ভাবলাম, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

গরুর চাইতেও হারামখোর প্রাণী সংসারে আছে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ছাগলের কথাটা আমাদের মাথায় আসেনি। এই প্রাণীটা কাঁটাতারের বেড়ার যে স্বাভাবিক ফাঁকটুকু আছে, তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে গলে ক্ষেতে প্রবেশ করতে পারে। ছাগলের মতো নিরীহ পশু কীভাবে আমাদের চারাগুলোর যম হয়ে দাঁড়াতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে ক্ষেতের চারাগাছ মনের আনন্দে খেয়ে চলে যায়, ভালো করে ঠাহরও করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যে গরুগুলো ঘুরে বেড়ায় তাদের সংখ্যা অল্প। কিন্তু ছাগলের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। ছাগলের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটা বাচ্চাকে মাসে মাসে টাকা দেব এই করারে সার্বক্ষণিকভাবে বসিয়ে রাখতে হল। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হল, বাচ্চাটি ক্ষেতে বসে থাকতে পছন্দ করে না। তার বয়েসী অন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো করতে দেখলে সে ছুটে চলে যায়। সেই অবসরে ছাগল এসে ক্ষেতের চারাগাছ নষ্ট করে ফেলে।

প্রফেসর লুৎফর রহমানের একটা খাসি পাঠানের মতো নির্বিকার ভাব নিয়ে বেড়া টপকে আমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করে। বাচ্চাটা দুরদুর করে খাসিটিকে তাড়াতে চেষ্টা করে, খাসিটি বাচ্চা ছেলেটাকে কেয়ারই করে না। লুৎফর রহমান সাহেবের ছেলেকে অনেকদিন ডেকে বলেছি খাসিটি আমাদের ক্ষেতের অনিষ্ট করে, তাঁরা যেন খাসিটি দয়া করে বেঁধে রাখেন। ছেলেটি কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। কিন্তু খাসিটির আনাগোনায় বিরাম নেই। একদিন আমরা খাসিটি বেঁধে ফেললাম। রাতের বেলা লুৎফর রহমান সাহেবের ছেলে খাসিটি নিতে এলে ধমক দিয়ে বললাম, আবার যদি খাসি ক্ষেত খেতে আসে জবাই করে খেয়ে ফেলব। লুৎফর রহমানের ছেলে পালটা ধমক দিয়ে বলল, তার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খাসিটির চরে বেড়াবার অধিকার আছে। বরঞ্চ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে চাষ করে বেআইনি কাজ করেছি। সুতরাং ক্ষেত ভক্ষণ করার অধিকার তাদের খাসিটির আছে।

গরু-ছাগলের আক্রমণ অনেক চেষ্টা করে কিছু পরিমাণে ঠেকানো সম্ভব হল। কিন্তু চারাগাছের আরো এক মারাত্মক দুশমন আছে, সেকথা জানতাম না। একদিন সকালবেলা ক্ষেতে ঢুকে দেখি আট-দশটি বেগুন চারা এবং চারটি টম্যাটো চারা কে

যেন করাত দিয়ে কেটে দুটুকরো করে ফেলেছে। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি বেরিয়ে এল। বেড়া দিয়ে, এত কষ্ট করে গরু-ছাগল তাড়িয়ে চারাগুলো বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আনসার আলির দোকানে লোক পাঠিয়ে নতুন চারা আনিয়ে আবার লাগিয়ে দিলাম। আমার একটা জেদ চেপে গিয়েছে, যত ঝামেলা আসুক, আমি ক্ষেতের চারাগুলো রক্ষা করব। প্রতিদিন সকালে ক্ষেতে গেলে দেখতে পাই আট-দশটা চারা দুটুকরো করে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হল, বাকি চারাগুলো যেন রাতের অন্ধকারে খুন হওয়ার আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে। একই দৃশ্য প্রতিদিন আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। আমার এত সাধের ক্ষেত, সে কি শুধুশুধু কীটপতঙ্গের আহার হওয়ার জন্য।

উপায়ান্তর না দেখে আবার আনসার আলির শরণাপন্ন হলাম। আনসার আলি পানের পিক ফেলে বললেন, এইবার আসল দুশমনের পাল্লায় পড়েছেন। কীটনাশক কিনে পানিতে গুইলা সবগুলো চারার আগায় ছিটাইয়া দিবেন। আবার বেশি দিবেন না, চারার ক্ষেতি অইব। পানি এবং অষুধ মিলমতো দিবেন। বেশি পানি দিলে অষুধে ধরব না। আবার অষুধ বেশি দিলে চারার ক্ষতি অইব। সুতরাং আমাকে কীটনাশক ব্যবহার-সম্পর্কিত যাবতীয় কলাকৌশল রপ্ত করতে হল।

কার্তিক মাস না পেরোতেই আমাদের ক্ষেতের চারাগুলো এক আজব ঘটনা ঘটিয়ে দিল। সবগুলো চারা এত সবুজ, এত তাজা হয়ে বাড়তে আরম্ভ করল, চোখের দৃষ্টি আপনা থেকেই কেড়ে নিয়ে যায়। ক্ষেতের পাশ দিয়ে যারাই যাতায়াত করে এক নজর বাড়ন্ত চারাগুলোর দিকে না তাকিয়ে কারো উপায় নেই। বেগুন চারাগুলো ঝাঁকড়া হয়ে উঠতে লেগেছে। টম্যাটো চারার বাড় এত দ্রুত ঘটছিল, গোড়ায় গোড়ায় আমাদের কাঠি পুঁতে দিতে হল, যাতে পাতার ভারে চারা এলিয়ে না পড়ে। মরিচের একহারা চারা বাড়ছে এবং ডালপালা মেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফুলকপির পাতায় সকালবেলার শিশির-বিন্দুগুলো গলানো রুপোর মতো সূর্যালোকে ঝলমল করতে থাকে। থালিতে লাগানো জালি লাউ এবং মিষ্টি কুমোড়ের চারাগুলোর লতায় পরিণত হওয়ার আর বিশেষ দেরি নেই। জালি লাউয়ের চারাগুলোর গোড়ায় বরইগাছের শুকনো কাটা ডালগুলো পুঁতে দিলাম। কদিন পরেই তাদের লতানো শরীর থেকে আকর্ষীমূল বেরিয়ে বরইর ডালকে আঁকড়ে ধরবে।

বাঁধাকপির চারাগুলো আমাদের সবচে অবাক করে দিল। চারাগুলো একটু সেয়ানা হয়ে যখন চারপাশে পাতা ছাড়তে আরম্ভ করেছে, একদিন মৌলবি কুদ্দুস দাঁতে মেসওয়াক ঘষতে ঘষতে ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মুখ নিচু করে মুখগহ্বরের বর্জ্যপদার্থ ফেলে বললেন, আপনার বাঁধাকপির চারাগুলোর ঝুঁটি বেঁধে দেয়ার সময় হয়েছে। আমি কুদ্দুসের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বললাম, তাই নাকি? আমি জানতাম না। কুদ্দুসের স্বরে বিদ্রূপ খেলে গেল। আপনি কিছুই যখন জানেন না, বেহুদা চাষ করতে এলেন কেন? গভীর একটা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের মোটেই কিছু করা উচিত নয়। মৌলবি সকল সময়ে এতবেশি জ্ঞানের কথা বলেন যে সেগুলো আমরা হিসেবের মধ্যেই আনিনে। তারপর মৌলবি মেসওয়াকটা উলটো করে মাটিতে পুঁতে লুঙ্গিটা হাঁটু অবধি তুলে ক্ষেতের মধ্যে চলে এলেন। যত্ন করে পাতাগুলো

চারপাশ থেকে টেনে এনে সুন্দরভাবে মুড়ে দিতে থাকলেন। কুদ্দুসের হাত শিল্পীর হাত। কাজটা করতে গিয়ে একটা পাতার গায়েও আঁচড় লাগেনি। মোড়ানোর কাজটা শেষ করে প্রতিটি বাঁধাকপির মাথায় একটা করে মাঝারি আকারের মাটির ঢেলা তুলে দিলেন। বাঁধাকপির চারাগুলো ওইভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই প্রতিটি বাঁধাকপিকে বাচ্চা শিখের ঝুঁটিবাঁধা মস্তকের মতো দেখাতে থাকল।

আমি প্রতিদিন একটু একটু করে টের পেতে আরম্ভ করেছি, আমার চোখের সামনেই চারাগাছের শরীরে নীরবে একটার পর একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। চারাগাছে নতুন শাখা গজালে আমার দৃষ্টি এড়ায় না। নতুন পাতা যখন আত্মপ্রকাশ করে আবেগে আমার ভেতরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই চারাগাছগুলোর কোমল শরীরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তানের মতো একে একে যে সবুজ প্রাণ হিল্লোলিত হয়ে উঠছে, কোন গভীর পাতালে রয়েছে তার উৎস? আমি অনুভব করি বুকের মধ্যে এই সবুজ প্রাণের নীরব ঝংকার। আমার সমগ্র চেতনা চারাগাছের রঙে সবুজ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

হোস্টেলের বোর্ডারেরা হাতে অ্যাটাচি দুলিয়ে কেউ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে যান, কেউ ছোটেন লাইব্রেরিতে। সদ্যস্নাতা গিন্নিরা চাকরি করতে যান অথবা বাচ্চার হাত ধরে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন। আমি একটা কাজ পেয়েছি। সকালবেলা নাশতা খাওয়ার পর খুরপি, কোদাল নিয়ে ক্ষেতে ঢুকি। আগাছা তুলি, ক্ষেতে খুরপি চালিয়ে চারার পাশের মাটি আলগা করে দিই। জালি লাউয়ের ডগাগুলো বরইগাছের জাঙলায় যাতে উঠতে পারে সাহায্য করি। ফুলকপি গাছের পোকা-ধরা পাতা ছিঁড়ে ফেলি। এমনি ধরনের কত কাজ। ক্ষেতে ঢুকলেই চারাগাছেরা আধাদিন আটকে রেখে দেয়। কোনদিক দিয়ে যে বেলা বয়ে যায়, কোনো খেয়াল থাকে না। দুপুরবেলা সায়েবেরা ক্লাস থেকে, লাইব্রেরি থেকে ফিরে আসেন। বাচ্চারা স্কুল থেকে আসার পথে দুষ্টুমি করে, কেউ কেউ আমার ক্ষেতের সামনে থমকে দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায় বাচ্চারা নিজেরাও বোঝে না। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি। আমার ক্ষেতের উদ্ভিদ-বাচ্চারা মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে নীরবে খানিক বাক্যালাপ করে।

আমি যখন ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসি, তখন আমার হাতেপায়ে মাটি। কাপড়চোপড় সর্বত্র মাটির দাগ। ধবধবে প্যান্ট শার্ট পরা গলায় নেকটাই বাগানো সাহেবেরা আমার দিকে তাকিয়ে চিকন করে হাসেন। আমি কিছুই গায়ে মাখিনে। কোনো বিদ্রূপকে আমার বিদ্রূপ মনে হয় না। লোকে যা ইচ্ছে বলুক, আমি তো করবার মতো একটা কাজ পেয়ে গেছি। আমি জানি এই যে প্রতিদিন নিবিড় শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছি, মাস গেলে তার জন্য কেউ কানাকড়ি বেতন আমাকে দেবে না। তবু আমার দুঃখ নেই, নালিশ নেই। কেননা অস্তিত্বের ভার লাঘব করার মতো একটা কাজ আমি পেয়ে গেছি। মাসশেষে মাইনে পাইনে বলে আমি তো ফ্যালনা নই। আমি বুঝতে পারছি জগতে আমারও মূল্য আছে। আমি না থাকলে চারাশিশুগুলোকে দেখবে কে?

টাইপরা ভদ্রলোকের কথা যখন উঠল আমাকে ড. খায়রুল মিল্লাতের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। আমি এই জায়গায় বারো বছর ধরে আছি। ভদ্রলোক বোধ হয় আমার জন্মের সময় থেকেই থাকছেন। সপ্তাহে অন্তত কম করে হলেও তিনবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ভদ্রলোককে আমি একদিনও টাইবিহীন দেখিনি। এমনকি বৃষ্টি-

বাদলার দিনেও না। প্রায় দিন মিল্লাত সাহেব আসা যাওয়ার সময় আমার ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে নানারকম প্যাচাল পাড়তে থাকেন। এটা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি আমাকে বলে থাকেন, আমার ইচ্ছে হয়, আপনাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডেকে দেখাই। দিনে পঞ্চাশ টাকা দিলে যে কাজ একজন মজুরকে দিয়ে করানো সম্ভব, এরকম তুচ্ছ কাজে আপনার মতো একজন মানুষ শ্রম ব্যয় করবেন কেন? আমি তাঁর কথায় জবাব দিতে পারতাম না। তিনি মজুরি, শ্রম, মুনাফা অর্থনীতির এসকল দুরূহ তত্ত্ব আউড়ে যেতেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে এতদূর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম যে একদিন তাঁকে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে একদম ঘায়েল করে ফেলি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মিল্লাত সাহেব, বলুন তো আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন টাইটা কত বড় ছিল। তিনি আমার কথা বুঝতে না পেরে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁকে তখন বললাম, আমি এই জায়গায় বারো বছর ধরে আছি। আপনাকে একদিনও টাইবিহীন অবস্থায় দেখিনি তাই আমার ধারণা টাইসহ আপনি মাতৃজঠর থেকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার ব্যাখ্যা শুনে মিল্লাত সাহেব ডানহাতের ব্যাগটা বাঁহাতে চালান করে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হলেন। আমাকে কিছুই বলেননি। বুঝলাম ওষুধে ধরেছে, এর পর থেকে মজুরি, শ্রম এবং মুনাফাতত্ত্বের কথা আমাকে আর শুনতে হয়নি।

এই সময়ে মোস্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মোস্তান মানে নাজিমউদ্দিন মোস্তান, ইত্তেফাক পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার। কী করে পরিচয় হল উপলক্ষটার কথা বলি। পাকিস্তানের পদার্থবিদ প্রফেসর আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা শোনার ভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু ইত্তেফাক পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে আমার মনে হল প্রফেসর সালামের তত্ত্বটি বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এটা তো বড়ই আশ্চর্যের কথা। এমন সাংবাদিক আমাদের দেশে আছেন, সালাম সাহেবের দুরূহ তত্ত্বকে অতে অজগর এরকম সহজ করে বোঝাতে পারেন। ঠিক করলাম সেদিনই সন্ধেবেলা ইত্তেফাক অফিসে গিয়ে খোঁজ করব। এইরকম একজন কামেল মানুষ আমাদের দেশে আছে। সশরীরে গিয়ে যদি সালাম না করি নিজেকেই অসম্মান করব। গেলাম ইত্তেফাকে। নিউজ টেবিলে গিয়ে জিগগেস করলাম, নাজিমউদ্দিন মোস্তান কে? কর্মরত সাংবাদিকেরা এক লোককে দেখিয়ে দিলেন। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে রিপোর্ট লিখছে। শুধু মাথাটাই দেখা যাচ্ছে। এই একটুখানি মানুষ। কাপড়চোপড় আধময়লা। এরকম পোশাক পরা একজন মানুষকে আমি ক্ষেত পাহারা দেয়ার জন্যও রাখব না। অনিচ্ছে সত্ত্বেও টেবিলের সামনে গিয়ে সালাম করলাম। ভদ্রলোক চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের মধ্যে কিছু একটা ছিল। সুতরাং টেবিলের বিপরীত দিকের চেয়ারে আমাকে বসতে হল। ওইভাবেই মোস্তান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়।

একদিন মোস্তান আমার ঘরে এলেন। চাষবাস দেখলেন। চারাগুলোকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করলেন। চারাগাছের দৃতিয়ালিতে মোস্তানের সঙ্গে আমার একটা হৃদ্যতা জন্মে গেল। কিছুদিন বাদে মোস্তান আমাকে তাঁর লেখা একটি কবিতার খাতা দিয়ে গেলেন। সেই সময়ে আমি আন্তন ম্যাকারেঙ্কোর 'রোড টু লাইফ' বইটি পড়ি।

ম্যাকারেঙ্কো রুশ শিক্ষাবিদ। তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার টোকাই ভবঘুরে এবং অনাথ এতিমদের শিক্ষা দেয়ার একটি সুন্দর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এই বইটা সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে লিখেছেন। বইটা পাঠ করার পর আমার শিরায় শিরায় চঞ্চলতা খেলে যেতে লাগল। জীবনের আরো এক সম্প্রসারিত রূপ প্রত্যক্ষ করে ধমনির রক্ত উজানে চলতে আরম্ভ করল।

ভাঙাচোরা মানুষের শিশুর মধ্যেও মহামানবের অঙ্কুর রয়েছে। মানুষমাত্রই অমৃতের পুত্র একথা আগে কখনো এমন করে অনুভব করিনি। একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হল। আমার চারপাশে এত শিশু। এত অযত্ন এত অবহেলার মধ্যে তাদের জীবন কাটাতে হচ্ছে, এতদিন তাদের নিয়ে ভাবার অবকাশও হয়নি। একটা অপরাধবোধ পাথরের মতো মনের ভেতর চেপে রইল। আমি এই শিশুদের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিনি। আমার মনুষ্যজন্ম বিফল হয়ে যাচ্ছে। এই শিশুদের জন্য কী করতে পারি, এই চিন্তার মধ্যে এতদূর মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি ক্ষেতের চারাগাছগুলোর প্রতি যত্ন করার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম।

একদিন এরই মধ্যে মোস্তান এলেন। আমি তাঁকে বইটি পড়তে দিলাম। পরের দিন ভোর না হতেই দুয়ারে ঠকঠকানি শুনলাম। দরোজা খুলে দেখি মোস্তান। তাঁর চুলগুলো উস্কখুস্ক। বুঝলাম বাসিমুখেই তিনি চলে এসেছেন। চেয়ারে বসতে বসতেই বললেন, সারারাত জেগে বইটা শেষ করে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে, চোখের পাতা কাঁপছে। আমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ধন্যবাদ দিলাম। একজন মানুষ আমি পেয়ে গেলাম, যিনি আমার ভাবনায় ভাবিত। এ তো এক বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই সকালে নাশতার টেবিলেই দুজন মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, হোস্টেলে পেছনের কাঁটাবন বস্তির শিশুদের জন্য একটা স্কুল করে আন্তন ম্যাকারেঙ্কোর আইডিয়াগুলো পরীক্ষা করে দেখব।

স্কুল চালু করতে গিয়ে দেখলাম, স্বপ্ন হিসেবে এটা চমৎকার হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে একটা স্কুল গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মা বাবারাই প্রথম প্রশ্ন তুলল তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার পেছনে আমাদের কী মতলব। তাদের বাচ্চারা লেখাপড়া শিখছে না বলে তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা সর্বক্ষণ আমাদের পেছনে আঠার মতো লেগে রইল। আমাদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না খুঁটিয়ে জানার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। বন্ধুবান্ধবেরা বলতে আরম্ভ করল, আহমদ ছফা আরেকটা পাগল জুটিয়ে নিয়ে এবার ক্ষেত ছেড়ে বস্তিতে ঢুকেছে।

যে বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের এত উদ্যোগ আয়োজন, তাদের সঙ্গে প্রথম মুলাকাতের দিনে মনে হল আমরা লোহার কাঠে ভোঁতা বঁটি দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছি। বাচ্চারা বুঝতেই পারল না তাদের কেন লেখাপড়া শিখতে হবে। রাস্তার কাগজ কুড়িয়ে, লোহালক্কড়ের টুকরো সংগ্রহ করে, নিউমার্কেটে মিস্তির কাজ করে, হলের ছাত্রদের ফাইফরমাশ খেটে তারা তো বেশ আছে। অল্পস্বল্প পয়সাও হাতে আসে। সন্ধে হলেই মা-বাবার হাতে আট-দশ টাকা তুলে দিতে পারে। ভদ্রলোকের ছেলেদের মতো অত কষ্ট করে তাদের লেখাপড়া শিখতে হবে কেন, অবসরের সময়টাতে তারা ঘুড্ডি

উড়ায়, মারামারি করে, গ্রামদেশ থেকে বয়ে নিয়ে আসা গুলি ডান্ডা কিংবা হাডুডু খেলে। হরতালের দিন রিকশার পাম্প ছেড়ে দেয়, পুলিশদের ইট পাটকেল ছোড়ে। এই প্রচণ্ড উত্তেজনার জীবনের মধ্যে লেখাপড়ার স্থান কোথায়।

দ্বিতীয় দিনে বাচ্চাদের মা বাবাদের পেশার পরিচয় নিতে গিয়ে আমাদের কানে আঙুল দিতে হল। এই বাচ্চারা কেমন অবলীলায় জীবনের নিষ্ঠুর সত্যসমূহ প্রকাশ করতে পারে, সেকথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ধরুন একটা বাচ্চাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কী? সে বলল সেলিম। তারপরে যখন জিজ্ঞেস করলাম তোমার বাবা কী করেন? সেলিম মুখ খোলার আগেই পাশের বাচ্চাটি বলে বসল, বড় ভাই অর বাপ ছিঁচকা চোর। আরেকটা মেয়েকে বললাম, বলো তো তোমার নাম কী? মেয়েটি মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে রইল। জবাব দিল না। পাশের মেয়েটি বলল, বড় ভাই অর নাম মরিয়ম, হের মা ঘরে নাঙ ঢুকায়। দিনে দিনে এই ধরনের বুলির সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

একটি ছোট বাচ্চাকে পড়াতে গিয়ে আমাদের মুশকিলে পড়তে হল। বাচ্চাটার নাম বাবুল। বড়জোর সাত বছর বয়স। তার মা প্রচণ্ড নারীবাদী মহিলা। কম করে হলেও তিন মাসে একবার স্বামী পালটান। মহিলার শরীরের গাঁথুনি চমৎকার। চেহারায় আলগা একটা চমক আছে। ঠোঁট দুটো সব সময় পানের রসে ছোপানো। মহিলার স্বভাবের অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি দিক হল, বাচ্চাটার প্রতি তাঁর স্নেহ এত প্রবল যে, বাচ্চার গতিবিধির ওপর তাঁর মনোযোগ কম্পাসের কাঁটার মতো হেলে থাকে। আমরা বাচ্চাদের যখন পড়াতে বসলাম, কেউ-না-কেউ তার গায়ে একটা চিমটি কাটবে কিংবা একটা খোঁচা দেবেই। বাবুল অমনি লাফিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে আঘাত-দেয়া শিশুটির মা, খালা, নানি, দাদি, বোন, ফুফু সাত প্রজন্মে যত নারী আত্মীয়া আছে মুখ দিয়ে সকলের সঙ্গে কুকর্ম করতে থাকে। আধ ঘণ্টার আগে আর থামে না। যে বাচ্চাটির আত্মীয়দের সঙ্গে বাবুল এতক্ষণ মৌখিক কুকর্ম করল, সেও বসে থাকবে কেন? পালটা বাবুলের সাত প্রজন্মের নারী আত্মীয়দের মৌখিকভাবে বিধ্বস্ত করতে থাকল। বাবুল হেরে যাওয়ার ছেলে নয়। অপর ছেলেটির গায়ে হাতে ভীষণভাবে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। লড়ুয়ে মোরগ যেমন একে অপরকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে এই শিশুদের অবস্থাও তাই। শিশুদের অনেকে আসমান কা টুকরা, জমিনকা ফুল, স্বর্গের দেবদূত কতকিছু বলে থাকেন। কিন্তু তারা যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারে যার অভিজ্ঞতা হয়নি বুঝবে কেমন করে। বাবুল গায়েগতরে ছোট বলে প্রায় সময়ে বেশি মার খায়। বাবুলের মা ছেলের কান্না কী করে শুনতে পেত সেটাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। চিলের মতো ছোঁ মেরে এসে অপর ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের হয়ে শোধ নিতে থাকত। অপর ছেলেটিরও অভিভাবক আছে। হয়তো মা নয়তো বাবা। তারা ছুটে এসে গালাগালি মারামারিতে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়ে দিত। সেদিন পড়াশোনা লাটে উঠত। লড়াইটা যাতে আরো ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হত।

মোস্তান বাবুলকে ঠাণ্ডা করার একটা উপায় বের করেছিলেন। পড়াশোনা করার আগে তিনি বাবুলকে একটা জামগাছের গোড়ায় নিয়ে বলতেন, বাবুল এই জামগাছটাই আসল বদমাশ, দাও গাছটাকে কষে গাল দাও। বাবুল বিশ মিনিটেক ধরে জামগাছের

সপ্ত প্রজন্মের আত্মীয়াদের সঙ্গে মৌখিক কুকর্ম করে যেত। প্রাণভরে সেগুলো আমরা শুনতাম। বাবুলের জামগাছ পর্ব শেষ হলেই মোস্তান পড়াতে শুরু করতেন। এমনিতে বাবুল হাসিখুশি ছেলে। ওই অতটুকুন বয়স থেকে টাকা রোজগারের একটা চমৎকার কৌশলও সে রপ্ত করেছিল। বিশ টাকা দিলে সে শেখ মুজিবের সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে দেয়া ভাতে মারব পানিতে মারব বক্তৃতাটি দিত। পনেরো টাকা দিলে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর নকল করে বক্তৃতা দিত। দশ টাকায় হাসিনা আপা এবং পাঁচ টাকায় মান্না ভাই আখতার ভাইয়ের মতো বক্তৃতা দিত।

এমন আরেকটি অদ্ভুত ধরনের বাচ্চা ছিল আলমগীর। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে বলত হাসপাতাল। বাবা মা সবকিছুর পরিচয় দিত হাসপাতাল। আলমগীরের দিক থেকে হাসপাতালকে তার সবকিছু বলে পরিচয় দেয়ার একটি সংগত কারণ রয়েছে। আলমগীরের জন্ম হাসপাতালে। জন্মের সময় মা মারা যায়। বাবাকে সে কোনোদিন চোখে দেখনি। কীভাবে সে মানুষ হয়েছে, কে লালনপালন করে এত ডাগর করেছে সে সংবাদ কারো কাছে প্রকাশ করেনি। ছেলেটি নীলক্ষেত বস্তিতে থাকে। দুপুরবেলা পুলিশ ক্যান্টিন থেকে পুলিশদের খাবার নিয়ে যায়। নিজের দুপুরের খাবারটাও সেখানে খায়। বিকেলের নাশতা এবং রাতের খাবারটা জোটাবার জন্য নিউমার্কেটে মিস্তির কাজ করে কিংবা হলের ছেলেদের ফাইফরমাশ খাটে। এই বাচ্চাটাই সবচাইতে বেপরোয়া। তার ঘর বাড়ি মা বাবা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এসব কেন থাকতে হবে, সে বোঝে না। তাকে অক্ষরজ্ঞান শেখাতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হল, মোষের শিং থেকে দুধ বের করা তার চাইতে অনেক সহজ। অন্য বাচ্চারা যখন ঘরে মা বাবা ভাই বোনদের কাছে ফিরে যেত, আলমগীর উদাস নয়নে সে দৃশ্য দেখত। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে এমন নিঃসম্পর্কিত কোনো মনুষ্য শিশু ইতঃপূর্বে আমি দেখিনি। আলমগীর একা একা হাঁটত। আপনমনে বিড়বিড় করে কীসব বলত। জিগগেস করলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত। মা বাবা ঘর বাড়ি ভাইবোন ওগুলোর অনুভূতি কেমন জানতে চাইলে সে পাখির মতো ফুড়ুত করে রাস্তার দিকে ছুটে যেত। যেন রাস্তা তার মা, রাস্তা বাবা, রাস্তাই ভাইবোন ঘর বাড়ি দেশ গেরাম সবকিছু। এই শিশুটি অন্য শিশুদের ঝাঁকের সঙ্গে মিশে থাকত। তথাপি আমার তাকে অন্য গ্রহ থেকে ছিটকে পড়া কোনো প্রাণীর সন্তান বলে মনে হত।

ছেলেটার প্রতি আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে আমার ঘরে আমার সঙ্গে রাখব। আলমগীরকে আমার ইচ্ছের কথাটি জানালে সে হাঁ কিংবা না কিছুই বলল না। চুপ করে রইল। অন্য বাচ্চারা খোশামোদ করে বলতে লাগল বড় ভাই আমাকে নিয়ে যান, আমাকে নিয়ে যান। একজন বলল সে ঘরদোর পরিষ্কার রাখবে। আরেকজন জামাকাপড় ধুয়ে দেবে বলে ঘোষণা করল। তৃতীয়জন আমার ক্ষেত দেখার প্রস্তাব দিল। আলমগীর সেসবের ধার দিয়েও গেল না। দাঁত বের করে হাসতে লাগল। একবার অনিচ্ছেও প্রকাশ করল না। ছেলেটে যেন কী!

আমি আলমগীরের জন্য ছোট্ট একটা তোশক কিনলাম। তাকে জামাকাপড় বানিয়ে দিলাম। স্যান্ডেল কিনে দিলাম। আলমগীর থাকছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখতে পাচ্ছিনে। সে আমার কোনো কথা শোনে না। যখন-তখন

রাস্তায় ছুটে যায়। তার এই অনিকেত স্বভাবটি ভুলিয়ে দিয়ে তার ভেতর কতিপয় নতুন অভ্যেস তৈরি করার জন্য পণ করে বসলাম। বারবার চেষ্টা করেও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ ভেতরে ভেতরে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। যাতে সঙ্গদোষ আর না ঘটে সেজন্য তাকে আমি সব সময়ে চোখে চোখে রাখতাম। কিন্তু ফল হল উলটো। বুঝলাম আলমগীর পোষ মানার বাচ্চা নয়। এর পর থেকে অল্পস্বল্প মারধোরও করতে থাকলাম। আমি নিজেকেই জিগগেস করলাম, এইরকম একটি লাওয়ারিশ বাচ্চার জন্য এত শ্রম, এত যত্ন আমি কেন ব্যয় করছি। যাহোক একটা জিনিস শুরু করেছি, শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।

আমি যেখানেই যেতাম আলমগীরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। আমাকে যখন আলমগীরের সঙ্গে দেখত অন্য বাচ্চারা হাততালি দিয়ে হেসে উঠত। তাদের সঙ্গে আলমগীরও হেসে উঠত। কেন হাসছে, কারণ জিগগেস করলে সকলে চুপ করে আমার দিকে তাকাত। একসময় আমার ধারণা হল, বাচ্চারা নিশ্চয়ই আমার কোনো খুঁত ধরতে পেরেছে। সেজন্যই আমাকে দেখলে খলখল করে হাসে। অথচ জিগগেস করলে কেউ কিছু বলে না।

একদিন বাবুলকে রাস্তায় একা পেলাম। তাকে কমলা এবং বেলুন কিনে দিয়ে বললাম, আচ্ছা বাবুল বলো তো বাচ্চারা আমার সঙ্গে আলমগীরকে দেখলে হাসে কেন? বাবুল বলল, বড় ভাই আপনে জানেন না? আমি বললাম, তুমি না বললে জানব কেমন করে? সে বলল, আপনে মায়ের পেডে আছেন, কিছু জানেন না। আলমগীর বলছে আপনে তারে ফাকাইবেন। হের লাইগ্যা সব দিতাছেন। এই ফাকাইবার অর্থ কী আমি জানিনে। আমি বললাম, বাবুল ফাকানো কী জিনিস? বাবুল বলল, বড় ভাই আপনে কিছু বোঝেন না, আলমগীর বলে একসময় আপনে তার লগে খারাপ কাম শুরু করবেন।

এতদিন আমরা বাচ্চাদের মাঠে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলাম। এখন ঘরের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দিল। সামনে বর্ষা আসবে। তা ছাড়া বাচ্চাদের মধ্যে পছন্দবোধ গজিয়ে গেছে। এগুলো সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো বাচ্চা। তাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং অবস্থান সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন। অন্য লোকের বাচ্চাদের স্কুলে যেতে তারা প্রতিদিন দেখে। ওদের স্কুলঘর রয়েছে। ওরা খেলাধুলো করে। এই বাচ্চারাও আমাদের কাছে স্কুলঘর দাবি করতে আরম্ভ করছে। তারাও অনুভব করতে চায় তাদের একটি নিজস্ব পরিচয় আছে। সেটিকেই তারা উর্ধ্বে তুলে ধরতে চায়। খেলার জন্য ফুটবল আমরা তখন তখনই কিনে দিলাম। কিন্তু স্কুলঘর বানাবার ব্যাপারটি রীতিমতো আমাদের ভাবিয়ে তুলল। একটি যেনতেন প্রকারের বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি এবং ওপরে পলিথিনের ঢাকনা দিয়েও ঘর তৈরি করতে দশ হাজার টাকার দরকার। অত টাকা আমরা পাব কোথায়?

কোরবানির ঈদ আসন্ন। আমরা শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললাম, আপনারা এই ঈদে তো কোরবানি দেবেন। চামড়ার টাকাটা আমাদের দান করুন। আমরা বস্তির বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল বানাতে যাচ্ছি। সকলেই বললেন, তোমরা খুব ভালো কাজ করছ। এইসব অবহেলিত শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে যাচ্ছ। এই প্রশংসা-

বাক্য শুনেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল। একজন ছাড়া কেউ কোরবানির চামড়া দিতে রাজি হলেন না। মাদ্রাসার হুজুরেরা প্রতি বছর চামড়ার টাকা নিতে আসেন। তাঁদের বঞ্চিত করা যাবে না। তর্ক করে লাভ নেই। বুঝে গেলাম মাদ্রাসার দাবি ঠেলে আমরা বস্তির শিশুদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। আমরা তো আর ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছিনে। আর নিজেরাও কেউ গোলটুপিঅলা হুজুর নই। আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে দান করলে তো পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাকে ধরল সাতই মার্চ উপলক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এই শিরোনামে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আমি দাবি করলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, এ বিষয়ে বক্তৃতা দেব ঠিকই, কিন্তু আমার স্কুলঘর বানিয়ে দিতে হবে। ফাউন্ডেশনের সব টাকা মসজিদ আর মাদ্রাসা খেয়ে ফেলবে এটা তো কাজের কথা নয়। এই বাচ্চাদেরও তো একটা হক আছে। কর্তা ব্যক্তিরা গাইগুঁই করতে থাকলেন। বললেন, স্কুলে অনুদান দেয়ার আমাদের নিয়ম নেই। আমি বললাম, নিয়ম নেই ভালো কথা, নতুন নিয়ম বানান। আপনাদের ফাউণ্ডেশনে তো লেখক সাহিত্যিক কেউ যান না, আমি তো নিয়ম ভেঙেই ওখানে যেতে রাজি হয়েছি। এবার চিড়ে একটুখানি ভিজল মনে হল। ডিরেকটর ইয়াহিয়া সাহেব পথ একটা বাতলে দিলেন। হ্যাঁ, দশ হাজার টাকা আপনাদের দেয়া যেতে পারে। আপনি একটা দরখাস্ত করুন এবং লিখুন যে কোরান শিক্ষা দেয়ার জন্য আপনি একটা মক্তব বানাতে যাচ্ছেন। আমাদের তখন অনুদান দিতে আপত্তি থাকবে না। আমি বললাম, আমার ঘর হলেই হল। দরখাস্তে যা লিখতে বলবেন, লিখে দেব।

আমি যখন বললাম ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এই শিরোনামে বক্তৃতা দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবের ছিছি করতে লাগলেন। ফোর্ড কিংবা রকফেলার ফাউন্ডেশনে যদি আমি যেতাম সকলে মিলে আমার নামে ধন্য ধ্বনি উচ্চারণ করত। আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বকবক করে এলাম। সুখের কথা এই যে আমার ওই বক্তৃতার কারণে বাংলাদেশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়নি।

ফাউন্ডেশন থেকে দশ হাজার টাকা এনে আমরা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে গেলাম। তাঁরা খুশি হলেন। তাঁদের বস্তিতে একটা স্কুলঘর তৈরি হতে যাচ্ছে এটা রীতিমতো একটা খবর বটে। তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসে স্কুলের ভিটি তৈরি করার সময় আমাদের সঙ্গে মাটি কাটতে লেগে গেলেন। বাচ্চাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। স্কুলঘর অর্ধেক তৈরি হওয়ার পূর্বেই বইখাতাসহ দলে দলে বাচ্চারা ভিড় করতে লাগল। আমরা বাঁশের খুঁটি পুঁতলাম। চারপাশে বাঁশের বেড়া লাগালাম। ওপরের চালে পলিথিনের শিট দিয়ে ঢেকে দিলাম। বাস হয়ে গেল আমাদের স্কুল। স্কুলের একটা নাম দরকার। নানারকম নাম এল। কিন্তু আমরা নাম রাখলাম শিল্পী সুলতান শিক্ষালয়। ঠিক এই পরিবেশ থেকে না হলেও এই পরিবেশে জন্ম হয়েছে জগদ্বিখ্যাত শিল্পী এস. এম. সুলতানের। আমাদের এই স্কুল থেকেও এস. এম. সুলতানের মতো একজন মানুষ যদি বেরিয়ে আসে আকাঙ্ক্ষাকে তো ছোট করতে নেই।

আমি স্কুলের সঙ্গে আছি নামকা ওয়াস্তে। সিলেবাস ঠিক করা, পড়াশোনা করানো সব কাজ করেন মোস্তান। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিল এক তরুণ—রেজা।

আদর্শবাদী ছেলে, সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। এখন রেজা বেঁচে নেই। এই প্রাণসুন্দর তরুণটি অকালে মারা গিয়েছে। শেখানোর কাজে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। মোস্তান পড়ান আমি বসে বসে দেখি। তিনি দুনিয়ার হেন বিষয় নেই এই বাচ্চাদের কাছে আলোচনা করেন না। মোস্তানের মনে এতদিন ধরে যত উচ্চাভাব জমে জমে জলপ্রপাতের মতো ফুলে ফুলে উঠছিল এই বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে যতই বিলম্ব ঘটুক মোস্তান বাচ্চাদের কাছে দুনিয়ার যত ইতিহাসের গল্প আছে বলে যাচ্ছিলেন। গল্প বলা শেষ হলে ঘাড় উঁচিয়ে মোস্তান বাচ্চাদের জিগগেস করতেন, কী বলেছি তোমরা বুঝেছ? বাচ্চারা সকলে সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলত, হ্যাঁ বড় ভাই সব বুইজা ফ্যালাইছি।

মোস্তান এত অনুরাগ নিয়ে বাচ্চাদের শেখাচ্ছিলেন দেখে মনে মনে আমার খুব ঈর্ষা হত। অফিসের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত অবসর তিনি বাচ্চাদের পেছনে দিতেন। নিজের মেয়ে দুটোকেও তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে বসিয়ে দিতেন। আমি বলতাম, একটু কি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না মোস্তান? মোস্তানের ওই এক জবাব, বস্তির ছেলেদের সঙ্গে বসতে না শিখলে কোনো বাচ্চা সঠিক মানুষ হতে পারবে না। বড় বড় নামকরা স্কুলে বাচ্চারা বিদ্যার চাইতে অহংকারটা বেশি শিক্ষা করে। মাঝে মাঝে বউটাকেও নিয়ে এসে বাচ্চাদের লেখা শেখাতে লাগিয়ে দিতেন। মানুষ নিজেকে এত নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে কেমন করে?

মাঝে মাঝে মোস্তানকে মনে হত তিনি পৃথিবীর প্রথম শিশুদের শিক্ষিত করে তুলছেন। আর আমার নিজেকে মনে হত প্রথম মানুষ যে পৃথিবীতে চাষাবাদ চালু করতে যাচ্ছে।

এতদিনে বেগুনগাছগুলো এত বড় হয়েছে এবং এত উঁচু হয়েছে অনায়াসে বেগুনের ঝোপের মধ্যে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে। টম্যাটো গাছে ফুল আসতে শুরু করেছে। বাঁধাকপি ওঠানোর সময় হয়েছে। ফুলকপির ফুলগুলো ভাপের পিঠের মতো ফুলতে লেগেছে। জালি লাউয়ের লতা বরইগাছের ডালের উঁচু স্তরটিতে এসে ঠেকেছে। নতুন জাঙলা যদি না বসাই লকলকে ডগাগুলো হেঁট হয়ে মাটির দিকে নেমে আসবে। মিষ্টি কুমোড়ের লতা প্রসারিত হতে হতে সারা মাঠটা এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে পা ফেলার মতো একটুও খালি জায়গা নেই। মরিচের গাছগুলো শাদা শাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। সকাল সন্ধে যেসব মানুষ স্বাস্থ্যশিকারের উদ্দেশ্যে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, তাঁদের একাংশ এসে এই জ্বলন্ত সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কেন তাকান নিজেরাও বুঝতে পারেন না। এই চারাগুলো তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আমি যখন সকাল বিকেল ক্ষেতের দিকে তাকাই আমার মনের ভেতর একটা স্নিগ্ধ আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। একমাত্র সবুজ তাজা উদ্ভিদই এরকম নির্মল আনন্দ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

এই সবুজ উদ্ভিদের একটা যে আত্মা রয়েছে তার স্পর্শ আমার নিজের আত্মায় এসে লাগে। মুখে কোনো বাক্য আসতে চায় না। এইখানে ঈশ্বরের এই প্রাচুর্যের পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। কবি জীবনানন্দ দাশ অভিভূত চাষা শব্দটি কেন ব্যবহার করেছিলেন, তার মাহাত্ম্য একটু একটু করে বুঝতে আরম্ভ করেছি। ঈশ্বর যেমন তাঁর

সৃষ্টি নিখিলের দিকে অভিভূত নয়নে তাকিয়ে থাকেন, তেমনি আপন হাতে তৈরি ক্ষেতের পাশে দাঁড়ালেও চাষার অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

চাষাসুলভ সংস্কারগুলোও আমার মনে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। নানা ধরনের মানুষ আমার ক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়ায়। কে কেমন মানুষ আমি মুখ দেখে চিনতে পারিনে বটে, আমার ক্ষেতের উদ্ভিদগুলো তাদের সঠিক পরিচয় চিনতে পারে। তাদের কারো মনে যদি কোনো বদ মতলব থাকে তার প্রভাব আমার ক্ষেতের চারাগাছের ওপর অবশ্যই পড়বে। তাদের প্রাণ এত কোমল, এত সূক্ষ্ম এত স্পর্শকাতর যে মানুষের কুদৃষ্টি প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের নেই। মানুষের মন্দ চিন্তার ঢেউ চারাগাছের শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, বৃদ্ধি ঠেকিয়ে রাখে। দীর্ঘদিন ক্ষেতের চারাগাছের সহবাসে একটি ষষ্ঠেন্দ্রিয় আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। আমি বুঝতে পারি, কেন মানুষ ক্ষেতে ঢুকলে ক্ষেতের চারাগাছ আনন্দে নৃত্য করে। মন্দ মানুষ ক্ষেতে ঢুকলে, চারাগাছের শরীরে তাদের স্পর্শ লাগলে চারাগাছ অপরিসীম বেদনায় কাঁদে। গাছের ভাষা বুঝতে আমি পারিনে, শুধু অনুমান করি। দুষ্ট লোকের খারাপ নজর যাতে না লাগে একটি মাটির কালো হাঁড়িতে চুনের ফোঁটা লাগিয়ে ক্ষেতের ভেতর একটা কাঠির ওপর বসিয়ে দিলাম।

শাহানার একেবারে কোলের বাচ্চাটি, যার নাম রিয়াদ, সে-ই প্রথম আবিষ্কার করল। কারনিসের পাশের একটি বেগুনগাছে পাঁচ-সাতটি বেগুনি ধরনের ছোট ছোট ফুল এসেছে। ফুলগুলো ঢাকুল পাতার অন্তরাল থেকে উঁকি দিচ্ছে। একেবারে অতর্কিতে এসে পড়েছে বলে তাদের একটুখানি লজ্জা এবং একটুখানি গর্বের আভাস ভাবেভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে। এই এতটুকুন বাচ্চা ছোট ছোট চোখ দিয়ে দেখতে পেল কেমন করে, পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থাকা ফুলগুলো। অথচ আমি সারাদিন ক্ষেতের মধ্যে কাটাচ্ছি, আমার চোখে পুষ্প-বিকাশের কোনো আলামত ধরা পড়েনি। আমার ক্ষেতের বেগুনগাছে ফুল ফুটেছে। ইচ্ছে হল এই অপূর্ব সংবাদটি জনে জনে জানাই। হোস্টেলের করিডোরে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। যে সমস্ত মানুষ আসা যাওয়া করছে তাঁদের চোখের দিকে তাকাই, মুখের দিকে তাকাই। অবশেষে হতাশ হয়ে মেনে নিতে হল, এই সমস্ত ব্যস্তবাগীশ মানুষদের কাউকেই আমার গাছে ফুল ফোটার সংবাদটি প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এই অসহ্য আনন্দ তো আমি মনের মধ্যে ধারণ করতে পারছিনে। অগত্যা কাগজ কলম টেনে নিয়ে কতগুলো পঙ্‌ক্তি লিখে ফেললাম। শুরুর দিকটা এরকম—ফুলফোটানো সহজ কথা নয়। শূন্য থেকে মূর্ত করা সৃষ্টির বিস্ময়। পারে সে জন ভেতর থেকে ফোটার স্বভাব যার/ফালতু লোকের ভাগ্যে থাকে বন্ধ্যা অহংকার। সপ্তাহখানেক না যেতেই আমার ক্ষেতে অবাক ব্যাপার একের পর এক ঘটে যেতে লাগল। ফুলে ফুলে গোটা বেগুনক্ষেত ভরে উঠল। টম্যাটোর চারায় ছোট ছোট ফল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। মরিচগাছ বসে নেই। শাদা ফুলে তাদের সারা শরীর ঢেকে গেছে। মিষ্টি কুমোড়ের লতা থেকে হলুদ পুরুষ ফুল বেরিয়ে অল্প অল্প দুলছে। জাঙলার ওপরে জালি লাউয়ের শরীর থেকে ধবধবে শাদা ফুল বেরিয়ে পাতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। চারাগুলো একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ফুল ফোটাতে লেগেছে। এই দৃশ্য আমি যখন নিজের চোখে দেখি মুখের কথা মুখের ভেতর আটকে যায়। ভেতরের অনুভূতি

সদ্যোজাত শিশুদের মতো হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। আল্লাহ্‌র রাজত্বে এতসব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, কী আশ্চর্য কেউ চেয়ে দেখছে না। আমার ভেতরের রাগ অভিমান, ক্ষোভ সব কোথায় উধাও হয়ে গেল। একটা সার্থকতার বার্তা আমার ভেতরে ঢেউ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ফুল ফোটাতে পারি, ফল ফলিয়ে তুলতে পারি। আমার জীবন বিফল নয়।

কচি টম্যাটো বড় হচ্ছে, ঝুমকোর মতো মরিচের ভারে গাছগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছে। আট দশটা মিষ্টি কুমোড়ের বাচ্চা ভূমিতে শয়ন করে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। নরম জালি লাউয়ের সবুজ ফল বাতাসে দোদুল দোল, দোদুল দোল দোল খাচ্ছে। বেগুনের কথা পরে বলছি তার কারণ আছে। বেগুন থেকেই তো এই ক্ষেতের সূত্রপাত। সুতরাং বেগুনের কথা বলতে গেলে একটুখানি পক্ষপাত তো আসবেই। প্রায় চার রকমের বেগুন আমার ক্ষেতে শোভা পাচ্ছে। পয়লা গফরগাঁওয়ের গোল কালো বেগুনের কথা বলি। অল্পদিনের মধ্যেই বেগুনগুলো এমন আকার পেয়ে গেল অনায়াসে পুষ্ট স্তনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। শুধু বোঁটার অংশটি নেই। তেলতেলে মসৃণ শরীরে হাত বুলোতে কী আরাম। মনে হয় নারীর স্তনের পরশ নিচ্ছি। কারনিসের নিচে যে চারাগুলো লাগিয়েছিলাম, তার সবটাই বারোমেসে বেগুন। এই গাছগুলো সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। সোজা ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। মনে হবে না বেগুনগাছ। আমি পুরোনো দালানের বালি-মেশানো চুন গোড়ায় দিয়েছিলাম। সকলে বলল এই কারণেই তারা অস্বাভাবিক রকম বাড়ছে। বারোমেসে বেগুনগুলো কালো এবং লম্বাটে। তাদের বোঁটায় নরম নরম একধরনের কাঁটা আছে। বড় হওয়ার সময় বেগুনগুলো গরুর শিংয়ের মতো বেঁকেচুরে যায়। গফরগাঁওয়ের বেগুন এবং বারোমেসে বেগুন ছাড়া আমার ক্ষেতে ক্রিকেটের বলের মতো একধরনের গোল বেগুন ফলেছে। বেগুন-বিক্রেতাদের পরিভাষায় যার নাম আণ্ডা বেগুন। তাঁরা কেন আণ্ডা বেগুন বলে থাকেন, কৈফিয়ত আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া শাদা লম্বা আরেক ধরনের বেগুন অজস্র ফলেছে। এই বেগুনের ওপরের দিকটা একটু কালচে, নিচের অংশটা শাদা। তাতে চন্দ্রবোড়া সাপের মতো একধরনের নকশার আভাস লক্ষ করা যায়।

ফুলকপিগুলো তুলে নেয়ার সময় হয়েছে। টম্যাটোতে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। মরিচে কামড় বসানো যায় না, ঝালের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। বিকেলবেলা বাজারে থলে হাতে আমাদের পাড়ার যেসব ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা নিউমার্কেটে বাজার করতে যান, তাঁরা আমার ক্ষেতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এখনো বাজারে ক্ষেতের তরিতরকারি পুরোদমে আসতে শুরু করেনি। যা-ও আসে, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, আগুন ধরে যায়, এত দাম। পচাধচা বাসি তরিতরকারি নিয়ে ফিরে আসার সময় লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে দেখেন আমার ক্ষেতে টম্যাটো পাকছে, ঢাউস ঢাউস বেগুনপাতার জাল ভেদ করে পুষ্ট চেহারা প্রদর্শন করছে, কচি লাউ দুলছে, লকলকে ডগাগুলো আয় আয় করে ডাকছে। এই এতসব তাজা তরিতরকারি এখানে, অথচ তাঁদের কষ্ট করে বাজারে যেতে হচ্ছে, বেশি দাম দিয়ে বাসি জিনিস কিনতে হচ্ছে। আর আমি এখানে রাজ্যের তরকারি ভাণ্ডার আগলে রেখে শেঠ হয়ে বসে আছি। যক্ষের ধনের মতো সকাল সন্ধে ক্ষেত সামলাচ্ছি। কাউকে ধারেকাছেও আসতে দিচ্ছিনে।

প্রথম নালিশ করলেন তৌহিদুল আনোয়ারের বেগম। তিনি একদিন বলে বসলেন, ছফা ভাই আমাদের কষ্ট দেখে আপনার মনে কি একটুও করুণা হয় না। আমাদের কর্তারা তাজা তরকারির জন্য প্রতিদিন নিউমার্কেটে গিয়ে হাপিত্যেশ করছে। অথচ আপনি এখানে একেবারে চোখের সামনে তরিতরকারির পাহাড় সাজিয়ে বসে আছেন। আপনার ক্ষেতের বেগুন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, টম্যাটো পেকে ঝরোঝরো করছে, গাছের লাউ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আপনি এসব নিয়ে কী করবেন? আপনার বউ নেই, পরিবার নেই, একেবারে একাকী একজন মানুষ। এগুলো আমাদের দান করে দিন না কেন। যদি আপনার দান করার মন না থাকে পয়সা নিয়ে বিক্রি করেন। আমি বললাম, আমার ক্ষেতের জিনিস আমি দাম দিয়ে বেচব না এবং দানও করব না। বেগুন পাকুক, টম্যাটো পাকুক, আমি সবগুলোর বীজ সংগ্রহ করে আগামী সিজনে আমার বন্ধু আনসার আলির সঙ্গে বীজের ব্যবসা করব। তৌহিদের বেগম বললেন, আপনি যখন নিজের খুশিতে দেবেন না, আমাদের চুরি করা ছাড়া উপায় নেই। আমি বললাম, আপনাদের অভ্যেস থাকলে চুরি করবেন। কিন্তু আমার মানত শেষ করার পূর্বে কাউকে আমার ক্ষেতের ফসলে হাত দিতে দেব না। তমিজুদ্দিনের বেগম তেড়ে উঠে জবাব দিলেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে ফসল ফলিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো খাজনা দেননি। আইনত বিশ্ববিদ্যালয় খাজনা বাবদে অর্ধেক তরিতরকারি দাবি করতে পারে। সেই হিসেবে আপনার ক্ষেতের অর্ধেক তরিতরকারির মালিক আমাদের স্বামীরা। কারণ তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। ভদ্রমহিলার হুমকিতেও আমি এক ইঞ্চি নড়লাম না। বললাম, আপনাদের কর্তাদের উকিলের নোটিশ পাঠাতে বলবেন। আমি কোর্টে জবাব দেব। কিন্তু ক্ষেতের ফসল দিতে পারব না। তখন ভদ্রমহিলারা সকলে একজোট হয়ে আমাকে বখিল, কৃপণ ইত্যাকার বিশেষণে ভূষিত করতে থাকলেন। সোহেলের বউ তো মন্তব্যই করে বসল, এতদিনে বুঝতে পারলাম, এই মানুষটা এই বয়সেও কেন একটা বউ জোটাতে পারল না।

আমার একটা মানত ছিল। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম, ক্ষেতের প্রথম তরিতরকারি দিয়ে সুলতান স্কুলের বাচ্চাদের একবেলা খাওয়াব। মোস্তানের কাছে গিয়ে প্রথম গোপন কথাটা ভাঙলাম। তাঁর চোখে অনেকগুলো স্ফুলিঙ্গ জেগে উঠল। বাচ্চারা ক্ষেতের তরকারি দিয়ে একবেলা রান্না করে খাবে, তার চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছু হতেই পারে না। বাচ্চাদের জানিয়ে দিলেন আগামী শুক্রবার দুপুরবেলা স্কুলের পাশে ভাত-তরকারি রান্না করা হবে। তাদের নিজেদের রান্না করতে হবে, লাকড়ি জোগাড় করতে হবে, হাঁড়ি পাতিল আনতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে উৎসাহের তরঙ্গ বয়ে গেল। সকলে মিলে পাতাপুতা গাছের শুকনো ডাল-চ্যালাকাঠ কোথা থেকে এমনভাবে আনতে লাগল দুদিন না-যেতেই লাকড়ির পাহাড় জমে উঠল। আমরা স্কুলঘর থেকে একটু দূরে গভীর করে চারটা চুলো কাটলাম। বিষ্যুদবার দিন বাচ্চাদের ক্ষেতে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, বেগুন, টম্যাটো, ফুলকপি, পেঁয়াজ সব উঠিয়ে নিয়ে এসো। আমরা চার-চারটে পুষ্ট লাউ কেটে নামালাম। মিষ্টি কুমড়ো ওঠালাম পাঁচটা। একেকটা দুতিন কেজি ওজন। জালি লাউয়ের ডগা কাটলাম অনেকগুলো। এই পরিমাণ তরিতরকারি দিয়ে

অনায়াসে আশি পঁচাশি জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের একবেলার খাবার হয়ে যাবে। আমাদের বাচ্চা তো মোটে পঞ্চান্ন জন।

মোস্তান বললেন, বাচ্চারা তো শুধুশুধু তরকারি খেতে পারবে না। তার সঙ্গে ভাতও তো প্রয়োজন। আমি বললাম, আমরা আধমন চালও কিনব। বস্তির মুদি-দোকানটিতে যখন চাল কিনতে গেলাম, দোকানদার বললেন, তিনি বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য আধমন চাল এমনিতেই দান করবেন, কোনো দাম নেবেন না। মোস্তান বললেন, আপনি চালটা ফ্রি দিচ্ছেন, কিন্তু ডালটা আমরা দাম দিয়ে কিনব। দোকানদার ভদ্রলোক জানালেন সেটিও হতে পারবে না। ডাল তেল এবং মশলাপাতি যা লাগে সব তাঁর কাছ থেকে বিনা মূল্যে নিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে গোটা বস্তিতে চাউর হয়ে গিয়েছিল যে আগামী শুক্রবারে স্কুলের পাশে বাচ্চাদের জন্য খানা মেজবানির আয়োজন করা হচ্ছে।

সবকিছু এক জায়গায় এনে যখন জড়ো করা হল আমি গেলাম সোহেলের বউয়ের কাছে। মহিলা ডাইনিং টেবিলে কাঁথা বিছিয়ে শাড়ি ইস্ত্রি করছিলেন। মনে হল আমাকে দেখে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। তাঁকে কোনো কথাই বলতে না দিয়ে বলে ফেললাম, আগামীকাল সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত আপনাকে বুক করে ফেললাম। মহিলা সামনের চুল সরাতে সরাতে অনুনাসিক স্বরে বললেন, কাল আমি একটা ফ্রেঞ্চ ফিল্ম দেখতে যাব। আমি কড়াভাবে বললাম, ওটি বাদ দিতে হবে এবং তাঁকে আমার হয়ে খাটতে হবে। এত শক্ত করে কথা বলছেন যখন, আপনাকে বলতে হবে কালকে আপনি কী করবেন। আমি জানিয়ে দিলাম, কাল আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। তৌহিদ, তমিজুদ্দিন এবং অন্যসব ভদ্রলোকদের বেগমদের টেনে নিয়ে আসার দায়িত্ব আপনার। বিস্ময়ে মহিলার চোখজোড়া কপালে উঠে গেল। তা হলে ছফা সাহেব আপনার জেদও আছে। আমি বললাম, হ্যাঁ একটুখানি আছে। সব মহিলাদের ম্যানেজ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার।

শুক্রবার দিন সকালবেলা আমি শাহানা, তৌহিদের বেগম, তমিজুদ্দিনের মিসেস, সোহেলের বউ এরকম একপাল মহিলাকে একেবারে খেদিয়ে কাঁটাবনে সুলতান স্কুলের ধারে নিয়ে এলাম। বললাম, বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলছে, সুতরাং আপনারা কাজ লেগে যান। বাচ্চারা আমার ক্ষেতের তরকারি দিয়ে আজ বনভোজন করবে। তাদের মা-বাবারাও এসেছে। আপনারা রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করুন। তৌহিদের বেগম বলল, ছফা ভাইয়ের সবকিছু উদ্ভট। তিনি তাঁর ক্ষেতের তরিতরকারি প্রথম বস্তির বাচ্চাদের খাওয়াবেন আর আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন রাঁধুনিগিরি করতে। তমিজুদ্দিনের বেগম বেশ শ্রেণিসচেতন মহিলা। এই জঘন্য জায়গায় টেনে এনে তাঁকে অপমান করার জন্য পারলে বঁটি দিয়ে আমার মাথাটা ফাঁক করে দিতেন। সোহেলের বউটি ফুর্তিবাজ, বিদেশে পড়ালেখা করেছেন, সুন্দরী এবং বাপের টাকা সুনাম দুই-ই আছে। তিনি কাজটিতে মজা পেয়ে গেলেন। শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে কাজে লেগে গেলেন। মোস্তানের বউ এবং মেয়ে এসে ভারী ভারী কাজগুলো করতে আরম্ভ করল। সোহেলের বউ এমনভাবে কাজের ভেতর মশগুল হয়ে গেলেন, যেন এটা একটা মজার খেলা। এই বউটির অগ্রণী ভূমিকার কারণে অন্যান্য মহিলারা খুঁতখুঁতোনি বন্ধ করে এটা সেটা করতে লাগলেন। বাচ্চাদের মা এবং বোনদের মধ্যেও কেউ কেউ এসেছে। কেউ ভাত

রান্না করার দায়িত্ব নিল। কেউ ডাল। জালি লাউ, ফুলকপি, বেগুন, টম্যাটো একসঙ্গে মিশিয়ে এক কড়াইতে সব রান্না করা হল।

শুরু থেকে ক্ষেতের কাজে আমাদের যারা সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যে যাদের চিনি ডেকে আনার জন্য রেজাকে মুহসীন হল এবং সূর্য সেন হলে পাঠিয়ে দিলাম। তাদের সকলে না হলেও কেউ কেউ এল। সব মিলিয়ে এই রান্নাবান্নার ভেতর থেকে একটা উৎসবের আমেজ বেরিয়ে এল। বাবুল শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা দিয়ে শোনাল। ভদ্রমহিলারা অবাক হয়ে গেলেন। এই এতটুকুন বাচ্চা কী করে কণ্ঠস্বর এমন নিখুঁত করতে পারে। আমরা প্রথমে বাচ্চাদের খাওয়ালাম। তারপর তাদের মা-বোনদের। তারপর মুহসিন হল এবং সূর্য সেন হলের কৃষিসহায়ক বন্ধুদের। তারপর খাওয়ালাম ভদ্রমহিলাদের। খেতে খেতেও কেউ কেউ আমার নিন্দে করতে ভুললেন না। তমিজুদ্দিনের বেগম জানালেন বিয়ের নাম করে আমি সবাইকে মস্ত ফাঁকি দিয়েছি। এখন তিনি জানতে চান, আসল বিয়েটা কখন হবে। আমি বললাম, হবে হবে, এখন তো সবে প্রেমে পড়েছি। সোহেলের বউ বলল, প্রেমে তো আপনি সব সময়েই পড়েছেন, কিন্তু কোনো প্রেম তো বিয়ে অবধি গড়ায় না। আমি বললাম, বর্তমান প্রেমটার আলাদা একটা মজা আছে। ভদ্রমহিলার একটা জলজ্যান্ত স্বামীরত্ন রয়েছে। সেখানেই সবকিছু ঠেকে গিয়েছে। তৌহিদের বেগম বললেন, আপনি শুধু কেলেঙ্কারিই করবেন, বিয়ে আপনার কপালে নেই। খাওয়াদাওয়ার শেষে ভদ্রমহিলারা সকলে মিলে তাম্বুলরসে ঠোঁট সিক্ত করে আমার নিন্দে করতে লাগলেন। ভদ্রমহিলাদের খুশি করার জন্য আমার বলতে হল, এখন থেকে আপনাদের কার কোন তরকারি প্রয়োজন সকালবেলা জানিয়ে দেবেন। আমি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। শুধু দুপুরবেলার খাবারটা পালা করে আমার ঘরে পৌঁছে দেবেন। তমিজুদ্দিনের বেগম বললেন, আপনার মতো আঁটকুড়ে মানুষকে রেঁধে খাওয়ালে আমাদের পরিবারের অকল্যাণ হবে।

আমি জীবনে মনে করার মতো কোনো মহৎ কর্ম করিনি। রাজনীতির নেতৃত্ব দেইনি, সাহিত্যের সেনাপতিত্ব করিনি, পড়াশোনায় কখনো কৃতিত্বের পরিচয় রাখিনি। এমন ফলবান প্রেম আমার জীবনে কোনোদিন আসেনি যা আমার জীবনকে একটি স্থির বিন্দুতে দাঁড় করাতে পেরেছে। আমার গোটা জীবনটাই আমার কাছে একদম ফাঁকা এবং অর্থহীন মনে হয়। এ জীবনে আমি এমন কোনো কাজ করিনি যা আমার নিষ্ফল জীবনের ঊষর মুহূর্তসমূহে একটি সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে। তবু আমি যখন পেছনের দিকে তাকাই, আমার স্মৃতিতে সেই ফলবান ক্ষেতের ছবিটি মূর্ত হয়ে ওঠে, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি চারা, প্রতিটি লতা আলাদা করে শনাক্ত করতে পারি। এই ক্ষেতটিই আমার মনে চিরহরিৎ উদ্যান হয়ে বিরাজ করছে। মা-বাবা যেমন তাদের সন্তানের প্রথম বসতে শেখা, প্রথম হামা দেয়া, হাঁটতে শেখা, প্রথম কথা বলার কথা আজীবন মনে রাখতে পারে; আমিও তেমনি আমার ক্ষেতের চারাগাছের কোনটিতে প্রথম ফুল ধরেছিল, কোনটিতে কলি এসেছিল এবং কোনটিতে বিস্ফারিত পুষ্পের অন্তর মথিত করে ফল দেখা দিয়েছিল সব মনে করতে পারি। এই ক্ষেতের তরিতরকারি দিয়ে বস্তির শিশুদের একবেলা খাইয়েছিলাম, সেই শিশুদের উৎফুল্ল মুখমণ্ডল সেই উৎসবের অমল আনন্দের রেশ, আমার জীবনের প্রথম বীর্যপাত যেমন, প্রথম রমণীসঙ্গম যেমন,

তেমনি আমার মনে উজ্জ্বল আয়ুষ্মান হয়ে টিকে আছে। চোখ বন্ধ করলেই সেই শিশুদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই, তাদের কচিকণ্ঠের চিৎকার শ্রবণে জেগে উঠতে থাকে। তখন একটা অনুভূতি আমার মনে জেগে ওঠে। হয়তো আমার এই জীবনের সবটা একেবারে বিফলে যায়নি।

ক্ষেতের এই চারাগাছগুলো প্রায় সাড়ে তিন মাস আমাকে এক জায়গায় গ্রেফতার করে রেখেছিল। চাষা কেন তার ক্ষেত ছেড়ে দূরেটুরে কোথাও যেতে পারে না, এখন বুঝতে পারি। গ্রামের বাড়িতে আমার সামান্য জমিজমা আছে। যেতে যেতে একেবারে অল্পেতে এসে ঠেকেছে। জমিজমা না থাকলে এক দোষ থাকলে সাত দোষ। জমি থাকলে মামলা আছে, বেদখল আছে, খুন জখম সব আছে। জমি যখন মালিককে নাম ধরে ডাক দেয়, কবরে থাকলেও ছুটে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। আমাকে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রামের বাড়িতে ছুটতে হল। গিয়েছিলাম দুদিনের জন্য, কিন্তু সাত দিনেও ঝামেলামুক্ত হওয়া সম্ভব হল না। এদিকে আমি ভেতরের কানে শুনতে পাচ্ছি আমার ক্ষেতের চারাগাছগুলো আমাকে ডাকছে। একদিন গ্রামের বাড়িতে শুয়ে আছি। রাত কত বলতে পারিনে। ঘড়ি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। গ্রামদেশে রাত নটাকেও মনে হয় অনেক রাত। রাতের বেলা আমি সেই খাটটিতে ঘুমিয়েছি, যে খাটে সারাজীবন ঘুমিয়েছিলেন আমার বাবা, তারপর আমার বড় ভাই। হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে তীব্র প্রাণফাটা চিৎকার শুনলাম। আমার ক্ষেতের বেগুনগাছগুলো মাটি থেকে শেকড়সুদ্ধ উর্ধ্বদিকে লাফিয়ে উঠছে এবং যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করছে। সারারাত আর ঘুমোতে পারলাম না। আমার মন বলছে, কেউ আমার ক্ষেতের চারাগাছগুলোর নিশ্চয়ই কোনো ক্ষতি করেছে।

দিনের আলো ফুটলে প্রথম বাসেই আমি চট্টগ্রাম শহরে চলে এলাম। আমি বেলা নটার সময় শহরে এসে পৌছেছি। এখন টেলিফোন করলে ইত্তেফাক অফিসে মোস্তানকে পাব না। বেলা এগারোটার আগে মোস্তান অফিসে আসেন না। এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসার উপক্রম। ভেতরের ছটফটানি থেকে কিছুতেই মুক্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সকলে আমার এই অস্থিরতা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। অবশেষে ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘরে প্রবেশ করল। ঢাকার লাইন পাওয়াও অনেক ঝামেলা। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর ইত্তেফাক অফিস পাওয়া গেল। অপারেটর সাফ জানিয়ে দিল মোস্তান সাহেবের ডিউটি রাতে। নটার পরে টেলিফোন করতে হবে। সেই দিনটা কী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে আমাকে কাটাতে হয়েছিল, মুখে বয়ান করা সম্ভব নয়। আমার মধ্যে অস্থিরতার এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, যে-আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম, তাঁরা কোনো মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন কি না ভাবাগোনা করছিলেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করে অন্যদের অস্থির করে তুলেছি, মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। পরিবারটিকে স্বস্তি দেয়ার প্রয়োজনে জিনিসপত্র সব ওখানে রেখে এই একটু আসছি বলে একটা রিকশা ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। রিকশাঅলাকে বললাম, সদরঘাটের জেটির দিকে চালাও। রিকশা সদরঘাটে এলে আমি নেমে হেঁটে গিয়ে জেটিতে উঠলাম। জেটিতে চোর ছ্যাচড় পকেটমারদের আড্ডা। বেকার কিশোরেরা অভুক্ত অবস্থায় জেটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমার কিশোর বয়সে যেমন দেখেছি, জেটিটির অবস্থা এখনো তেমনি আছে।

তেমনি বাদামঅলা বাদাম বিক্রয় করছে, তেমনি পালিশঅলা ছেলেরা চিকন করে পা-লি-শ শব্দটি উচ্চারণ করে লোক ডাকছে।

এপাড় ওপাড় নৌকাগুলো যাওয়া-আসা করছে। এই যাওয়া-আসার বিরাম নেই। ওপাড়ের মানুষ এপাড়ে আসছে। এপাড়ের মানুষ ওপাড়ে। তরিতরকারির নৌকো এসে ভিড়ছে। কর্ণফুলির বুকে তরঙ্গ তুলে পানি কেটে কেটে লঞ্চ ছুটে যাচ্ছে। দুটো গাধাবোট ঘাটে নোঙর করে আছে। নদীর ওপাড়ে ভালো করে তাকালে গ্রামের রেখা দেখা যায়। এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি ক্ষেতের কথা একেবারে ভুলে গেলাম। এভাবে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়ার পর আমি অনুভব করলাম, আমার ছটফটানিটা কমে এসেছে এবং আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। সেই আত্মীয়ের বাড়িতে ফিরে ভাত খেলাম এবং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একেবারে পাঁচটার পরে। হাতে এখনো অনেক সময়। যে-জমি নিয়ে মামলা চলছে উকিলের বাড়ি গেলাম। উকিলের সঙ্গে দাগ নম্বর খতিয়ান নম্বর, আর এস জরিপ, সি এস জরিপ, সাফ কবলা, হেবা দানপত্র এইসব ওকালতি পরিভাষায় আলাপ করে নগদে তিনশত টাকা ফি দিয়ে নটার একটু পরে আত্মীয়ের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার ভেতরের অস্থিরতা প্রকাশ করে অন্য সবাইকে বিব্রত করে না তোলার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছিলাম। সকলের সঙ্গে আমিও রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর ঢাকায় টেলিফোন করলাম। লাইন পাওয়া গেল। মোস্তানকেও। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম, স্বপ্নে আমি বেগুনগাছগুলোকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে শুনলাম কেন। মোস্তান জানালেন, কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকের বরইগাছের ডালগুলো সরিয়ে কে একজন ক্ষেতের ভেতর গরু ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো মিসেস সোহেল দেখতে পেয়েছিলেন নইলে একেবারে সর্বনাশ করে ফেলত। আমি বললাম, চারাগাছগুলোর কি বেশি ক্ষতি হয়েছে? মোস্তান জবাব দিলেন, আপনি এলে নিজের চোখে দেখতে পাবেন।

দুদিন পরে ঢাকা এলাম। ক্ষেতের বেগুনগাছগুলোর যা অবস্থা করেছে দেখে আমার কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আট দশটা ফলন্ত বেগুনগাছ একেবারে উঠিয়ে ফেলেছে। ডাঁটাগুলো মূলসুদ্ধ ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে। বাকি অংশ এমনভাবে খেয়ে ফেলেছে, দেখে অনুমান করারও উপায় নেই, বেগুনক্ষেতের ভেতরে অনায়াসে একটা দুটো বাঘ লুকিয়ে থাকত পারত। ক্ষেতের এই ন্যাড়া অংশটুকু দেখার পর আমার মনে হল, আমার বুকের ভেতরে একটা মরুভূমি জেগে উঠছে। আমি কাউকে কিছু না বলে ক্ষেতের গোড়ায় বসে রইলাম। কে এই নিষ্ঠুর কর্ম করতে পারে, তাই নিয়ে নানা কল্পনা এবং অনুমান চলছিল। সেগুলো আমি কানে তুললাম না। একজনের ক্ষেতে আরেকজন গরু ঢুকিয়ে দিয়ে ফসল নষ্ট করে থাকে, গ্রামদেশে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। গ্রামের চাষার নানাবিধ সদ্‌গুণের পাশেও তার ভিতরে যে নিষ্ঠুরতা রয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। এক বিঘত জমির জন্য কোদালের এক ঘায়ে ভাই ভাইয়ের মাথা নামিয়ে দিতে পারে। প্রতিবেশীর গরুটা মনের সুখে চোখের সামনে চরে বেড়াচ্ছে, তার চোখে দেখতে খারাপ লাগছে বলে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু এটা তো গ্রাম নয়। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মাঝখানে এখানে এমন শত্রু কে আছে যে গ্রামীণ বর্বরতার প্রকাশ ঘটিয়ে

আমার ক্ষেতটার এমন সর্বনাশ সাধন করতে পারে। উপড়ে-তোলা বেগুনের ডাঁটাগুলো কুড়িয়ে জমা করে মা যেমন মরা বাচ্চার পাশে বসে থাকে তেমনি বসে রইলাম। এই বাচ্চারা আমার, তাদের মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তচিৎকার আমার কাছে পাঠিয়েছিল। সেই চিৎকার আমার বুকের ভেতর এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।

গাছপালার কিছু অনুভব আমার অনুভবে সঞ্চারিত হয়। তাও সমস্ত গাছের নয়, যেসব গাছপালাকে নিজের হাতে আদর যত্ন দিয়ে বড় করে তুলি, তাদের যদি কোনো বিপদাপদ ঘটে আমি টের পেয়ে যাই। হয়তো স্বপ্ন দেখি। নয়তো জাগ্রত অবস্থায় তাদের কথা মনে পড়ে যায়। আমার পোষা গাছপালাগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটার কথা বারবার মনে পড়তে থাকে, আমার বুঝতে বাকি থাকে না, এই নির্বাক প্রাণসত্তাটির কোনো একটা বিপদ ঘটেছে। যে সমস্ত গাছপালা আলাপ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে চেতনায় ইনডিভিজুয়েল হিসেবে স্থান করে নিতে পেরেছে একমাত্র তারাই আমার কাছে আপৎকালীন সংকেতবার্তা পাঠাতে পারে, অন্যেরা না। আমি স্বীকার করি গাছের প্রাণ আছে, সে প্রাণের সুখ দুঃখ আনন্দ অনুভূতি সবটাই মানুষের প্রাণে তরঙ্গিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার আগে মনুষ্যচেতনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে বৃক্ষচেতনার তরঙ্গপ্রবাহের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিতে হয়। সেটি খুব সহজ কাজ নয়। বৃক্ষ যার-তার কাছে তার আসল স্বরূপ উন্মোচন করে না।

আমার এক বন্ধু সংবাদপত্রে পাঠ করা একটি ঘটনা আমার কাছে বলেছে। বেশি দিন আগের ঘটনা নয়, আবার বেশি দূরেরও নয়। টাঙ্গাইলের এক ভদ্রলোক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁর প্রাণের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। একজন লোক তাঁকে পরামর্শ দিলেন আপনি প্রতিদিন স্নান করে পরিচ্ছন্ন হওয়ার পরে আপনার একটি স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষ দুহাতে জড়িয়ে ধরে বৃক্ষদেবতার কাছে সরল অন্তরে এই প্রার্থনা জানাবেন : বৃক্ষদেবতা আপনি অনুগ্রহ করে আপনার শরীরে আমার রোগটা গ্রহণ করুন এবং আপনার সুস্থতা আমার শরীরে সঞ্চারিত করুন। এই ভদ্রলোক প্রতিদিন সকালবেলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বহস্ত রোপিত আমড়াগাছটি বেষ্টন করে একই প্রার্থনা জানাতেন। একমাস পরে দেখা গেল, মানুষটি সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং গাছটি মারা গেছে।

গাছপালাকে বেষ্টন করে যে দেবতা বাস করে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় বনদেবতার সঙ্গে সংলাপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর উপস্থিতি আমি আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করেছি, কিন্তু কখনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমি বিশ্বাস করি আমার শিক্ষক সারদাবাবুর সঙ্গে বৃক্ষদেবতার একটা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল। ভদ্রলোকের পুরো নাম সারদাশংকর তালুকদার। তিনি স্কুলের নিচের ক্লাসে থাকার সময়ে গ্রামার, ট্রান্সলেশন এবং অঙ্ক পড়াতেন। ওপরের ক্লাসে পড়াতেন ভূগোল। মনে হত তিনি যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কথা বলতেন। জীবনে তিনি কোনোদিন বেত হাতে ছাত্রদের শায়েস্তা করেননি। অত্যন্ত ফাজিল এবং বেপরোয়া ছাত্রদেরও দেখেছি তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতে। সারদাবাবুর কথার মধ্যে কী একটা ছিল। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ একেবারে চেতনার মধ্যে গেঁথে গিয়ে মধুবিন্দুর মতো জমে থাকত। ভদ্রলোক পাঠ্য বিষয়ে কথা বলতেন

অল্প। সুযোগ পেলেই আত্মা-পরমাত্মা এসব দিকে ছুটে যেতেন। গাছপালা এবং কৃষি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। দুনিয়ার কোথায় কে কীভাবে কৃষিতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন সেগুলো আমাদের কাছে বয়ান করতেন। তাঁর মাথাভরা ছিল চকচকে টাক। মাত্র চাঁদির ওপরে আট-দশগাছি চুল ছিল। সেগুলোকে বড় হতে দিতেন না। আত্মা-পরমাত্মা এগুলোর কথা খুব বলতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। আমাদের পণ্ডিত মশায় রমণীবাবু তাঁকে তৃণবিশারদ নাস্তিক বলতেন। আমাদের স্কুলের হিন্দু ছেলেরা সরস্বতী পুজোর সময় তাঁকে সাধ্যসাধনা করেও পুজোর মণ্ডপে হাজির করতে পারত না। তিনি কোনো ধর্মকর্ম করতেন না। কিন্তু তাঁর চাল-চলন জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে এমন একটা ভাব ফুটে উঠত, মনে হত তিনি একটা ধর্মজীবন যাপন করে চলেছেন।

আমাদের এই সারদাবাবু বছরে একবার পাগল হয়ে যেতেন। একবার পাগলামোতে পেয়ে বসলে তিন মাস সেই অবস্থায় থেকে যেতেন। শীত বাড়তে আরম্ভ করলে তাঁর পাগলামোটা শুরু হয়ে যেত। একদিন দেখা গেল তিনি গাছপালার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। পাগলামো শুরুর দিকে তিনি অল্প স্বল্প সাংসারিক কাজকর্ম করতেন। এমনকি ক্লাস নিতেও আসতেন। হয়তো আমাদের ভূগোলের ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাস শেষ করার আগেই বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন, ওই যে আলিমাঝি পুকুরের পাড়ে পুরোনো বটগাছ আছে না, সেই গাছটা আমাকে ডাকছে, ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সুতরাং যেতে হয়। তিনি হনহন করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেন। বটগাছের গোড়ায় গিয়ে কখনো মৃদু কণ্ঠে কখনো উচ্চ কণ্ঠে কথা বলে যেতেন। কখনো হাতে তালি দিয়ে নাচতেন কখনো খলখল করে হাসতেন। তাঁর পরিবারের লোকের কাছে সংবাদ গেলে তাঁরা এসে বাড়িতে ধরে নিয়ে যেতেন। বাড়িতে তাঁকে আটকে রাখা একরকম অসম্ভব ছিল। একটুখানি ফাঁক পেলেই তিনি ছুটে বেরিয়ে আসতেন। পছন্দের গাছগুলোর সঙ্গে এমনভাবে আলাপ জুড়ে দিতেন যেন বহুদিনের পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, রাগ করে, তিনিও তেমনি রাগ আনন্দ এসব প্রকাশ করতেন। এই সময় গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা তাঁর পেছনে লেগে যেত। তারা তাঁর গায়ে ধুলোবালি মাখিয়ে দিত, গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফেলত। সারদাবাবু নির্বিকার। দুষ্টু ছেলেদের দৌরাত্ম্য অধিক হলে তিনি একদম পাহাড়ে চলে যেতেন। সেখানে গাছপালার সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যেতেন। এই সময়ে তাঁর রাত-দিন জ্ঞান থাকত না। যদি কোনো হিংস্র প্রাণী এসে তাঁকে এই অবস্থায় আক্রমণ করে বসে, সেজন্য তাঁর পরিবারের লোকেরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। পাহাড়ে বাঁশ কাটতে, কাঠ কাটতে যারা যেত তাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে তাঁরা তাকে ধরে নিয়ে শেকল দিয়ে গাছের মোটা গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। বন্ধনটা যদি দুতিন দিনের বেশি স্থায়ী হত তিনি দাঁত দিয়ে আপন শরীর দংশন করে রক্তাক্ত করে ফেলতেন। এ অবস্থায় তাঁকে কিছু খাওয়ানো দায় হয়ে পড়ত। শীত পড়লে তাঁর পাগলামোর মাত্রাটা বেড়ে যেত। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ধরেটরে পাহাড়ের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। গাছপালার সঙ্গে হাসাহাসি ঝগড়াঝাটির পালা শেষ হলে আবার ধরে এনে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন।

শীতকালটা গেলেই সারদাবাবু আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন। ক্ষেত খামার গরু বাছুরের প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং রীতিমতো দুমাইল পথ হেঁটে স্কুলে যেতেন। তাঁর চাকরি কী করে টিকে থাকত আমি বলতে পারব না।

আমি সারদাবাবুর ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগত। ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে চলে যেতাম। তাঁর স্ত্রী আমাকে কাঁসার বাটিতে করে ফেনা-ওঠা গরম দুধ খেতে দিতেন। কোনোদিন দুধের সঙ্গে থাকত খই, কোনোদিন মুড়ি। সারদাবাবু যখন ক্ষেতে যেতেন আমিও সঙ্গে যেতাম। তাঁর সঙ্গে ক্ষেতের আগাছা নিড়াতাম। সার মাটির ঝুড়ি মজুরদের সঙ্গে ক্ষেত অবধি বয়ে নিয়ে যেতাম। তাঁর পাগলামোর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার শুরুর দিকে আমাকে প্রায়ই বলতেন, তিনি গাছপালার ভাষা বুঝতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, মানুষের ভাষা আর গাছের ভাষা এক নয়। গাছের সঙ্গে গাছের ভাষায় যখন তিনি আলাপ করেন, মানুষের ভাষাটি একেবারে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। তখন গড়বড় হয়ে যায়। তিনি কোনো খেই রাখতে পারেন না অর্থাৎ পাগল হয়ে যেতে বাধ্য হন। যখন তাঁর সঙ্গে একা থাকতাম, তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন গাছের সঙ্গে কথা বলার কৌশলটা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। গাছেরা সব মানুষের ডাকে সাড়া দেয় না। আবার সব মানুষ গাছদের ভাষাও বুঝতে পারে না। মনের বিশেষ ধরনের শুদ্ধতা না থাকলে গাছের ভাষা বোঝার ক্ষমতা মানুষের জন্মায় না। সারদাবাবু মনে করতেন গাছের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা আমার আছে, তবে বিকাশ লাভ করেনি। তিনি আমাকে পরামর্শ দিতেন, তিনি যখন গাছপালার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে থাকি। একসময়ে আমিও কথা বলতে পারব। কিন্তু আমি সাহস করতে পারতাম না। কারণ একটাই, ওই পাগল হয়ে যাওয়ার ভয়। বৃক্ষ বিষয়ে যে অনুভবশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি আমার জন্মেছে তার পেছনে সারদাবাবুর প্রভাবই অনেকখানি দায়ী।

সারদাবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ষোলোই ডিসেম্বরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরে ঢাকায় ফিরেছি। মা বারবার সংবাদ পাঠানোর পরেও বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে বাড়ি গেলাম। আমাদের বাড়ি থেকে সারদাবাবুর বাড়ির দূরত্ব পাঁচ মাইল। তিনি কার কাছে শুনেছেন আমি বাড়িতে এসেছি। একদিন খুব সকালবেলা তিনি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন এবং আমাকে জাগিয়ে তুললেন। আমি পায়ের ধুলো নিলাম। কিন্তু তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিগগেস করতে সাহস করতে পারলাম না বিগত নয় মাস তিনি গাছপালার সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে দিয়েছেন, নাকি গ্রামের অন্যান্য লোকের সঙ্গে কোথাও পালিয়েটালিয়ে ছিলেন। সারদাবাবু আমাকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে নিজে শুরু করলেন। এই এতটা পথ তোমাকে একটা কথা বলার জন্যই হেঁটে এসেছি। আমি বললাম, স্যার আগে চেয়ারে বসুন। সারদাবাবু বললেন, চেয়ারে বসার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। একটা কথা বলতে এসেছি, বলা হয়ে গেলেই চলে যাব। এই মানুষের সঙ্গে তর্ক করার কোনো অর্থ হয় না। আমি বললাম, স্যার আপনার কথাটা বলুন। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে শেখ মুজিবের দেখাসাক্ষাৎ হয়? সারদাবাবুর হিসেব একেবারে পরিষ্কার। আমি ঢাকায় থাকি আর শেখ

মুজিবও ঢাকায় থাকেন। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের নেতা। সারদাবাবু ধরে নিয়েছেন আমার সঙ্গে শেখ মুজিবের ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকে। আমি একটুখানি সংকটে পড়ে গেলাম। যদি বলি যে আমার মতো একজন আদনা মানুষের সঙ্গে শেখ মুজিবের দেখা হওয়া অসম্ভব তা হলে তিনি একবারে মুষড়ে পড়বেন। তাঁর এতটা পথ এই সকালে হেঁটে আসাটা নিরর্থক হয়ে যায়। তাই বললাম, শেখ মুজিবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয় বটে। সারদাবাবু জানতে চাইলেন তাঁর শরীর কেমন? আমি বললাম, এখন ভালো, তবে ভীষণ ব্যস্ত।

সারদাবাবু এবার চেয়ারে বসলেন। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, তুমি মুজিবকে আমার নাম করে বলবে এখন মুজিববাদ বলে যে শব্দটা সকলে ব্যবহার করছে সেটা অশুদ্ধ, আসলে হওয়া উচিত মৌ-জীব-বাদ। আমি বললাম এর অর্থ কী বুঝিয়ে বলুন। সারদাবাবু বললেন, মুজিব হল একজন মানুষের নাম। পবিত্র বিষয়ে মানুষের নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। লোকের জ্ঞান নেই বলে মুজিবের নামের ধুয়ো দিচ্ছে। মৌমাছিরা নানা জায়গা থেকে মধু আহরণ করে এক পাত্রে সঞ্চয় করে, তারপর প্রয়োজনমাফিক সকলে ভাগজোক করে আহার করে। মৌমাছির জীবনধারণ পদ্ধতির যে দর্শন সেই জিনিসটাই হল মৌজীববাদ। তুমি ঢাকা গিয়ে প্রথমে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বলবে, নামটা হবে মৌজীববাদ, মুজিববাদ নয়। আমি কথা দিলাম, ঢাকা গিয়েই প্রথমে শেখ সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে দরবার করব। সারদাবাবু আর একটা কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন।

উনিশশো পঁচাত্তর সনের চোদ্দই আগস্টের রাতে সপরিবারে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার সপ্তাহখানেক পরে সারদাবাবুর একখানি চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছিলেন, "দীর্ঘজীবেষু আহমদ ছফা, আমি উনিশশো বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে তোমার মাধ্যমে মুজিববাদ শব্দ বাদ দিয়ে মৌজীববাদ শব্দটি ব্যবহার করিবার পরামর্শ দান করিয়াছিলাম। এখন স্পষ্ট ধারণা করিতেছি, তুমি দায়িত্বটি পালন কর নাই। শেখ সাহেব যদি মুজিববাদ শব্দটি পরিহার করিয়া মৌজীববাদ শব্দটি ব্যবহার করিতেন এমন নিষ্ঠুরভাবে খুন হইতেন না। আমি সবকিছুর জন্য তোমাকে দায়ী করিতেছি...।" উনিশশো পঁচাত্তর সালের আগস্ট মাসে সারদাবাবুও ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। সেই সময়ে তাঁর স্কুলমাস্টারির চাকুরি ছিল না, জমি ছিল না, চাষ ছিল না। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। ছেলেরা চাকরিবাকরি নিয়ে দূরে দূরে চলে গিয়েছিল। কেবল গাছপালার সঙ্গে কথা বলার পাগলামোটা শেষ পর্যন্ত তাঁর ছিল। এই পাগলামোই তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন।

খুব ছোটবেলার কথা। তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের রান্নাঘরের লাগোয়া একটি বিশাল আমের গাছ ছিল। গাছটা অনেক পুরোনো। কতদিনের কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। আমার বাবা বলতেন আমার দাদির যখন বিয়ে হয়, তখন আমগাছটা তরুণ ছিল। বয়সের প্রবীণতা ছাড়াও গাছটার বেড় এবং উচ্চতার কারণে সকলের কাছ একটা শ্রদ্ধার আসন আপনিই অধিকার করে নিয়েছিল। প্রাণহরি এবং শ্রীহরি ধুপির মা থুথুরে বুড়ি ক্ষ্যান্তমণি গাছটিকে গড় হয়ে প্রণাম জানাত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ফোকলা দাঁতে উচ্চারণ করত বি রি ক্ষি। এই ধরনের প্রবীণ

গাছকে শুধু গাছ বলে সম্বোধন করলে বৃক্ষদেবতা কুপিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। তাতে গেরস্তের অকল্যাণ হতে পারে।

ক্ষ্যান্তবুড়ির হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আমাদের বাড়ি এবং আমাদের পাড়ার সবাই এই বিশাল তরুটিকে গাছ বলেই ডাকত। তবে তার একটি নামকরণ পূর্ব থেকে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গাছটিকে সবাই বলত আষাঢ়ে আমের গাছ। কারণ এই গাছের আমগুলো আষাঢ় মাসের শেষের দিকে পাকতে আরম্ভ করত। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকেও উঁচু ডালে দুয়েকটি আম দুলতে দেখা যেত। এই গাছের আমগুলো আয়তনের দিক দিয়ে খুব বড় হত। আম পেকে শাখায় শাখায় দুলত কিন্তু এত উঁচুতে যে মানুষজন সে-আমের নাগাল পেত না। সিঁদুরবরন আমগুলো যখন পাকত কাকপক্ষীরা এসে আমের শরীরে ঠোকর বসাত। তখন আমটা নিচে পড়ত। হঠাৎ যখন বেগে হাওয়া বইত তখনো গাছ থেকে পাকা আম নিচে ঝরে পড়ত। গাছ থেকে আম সরাসরি মাটিতে পড়তে পারত না। প্রথমে পড়ত আমাদের বড় ঘরের টিনের চালে, সেখান থেকে গড়িয়ে শনে-ছাওয়া রান্নাঘরের চালে। এই রান্নাঘরের চাল থেকে যখন আম মাটিতে পড়ত তখন আমত্ব কিছু খুঁজে পাওয়া যেত না। একরকম থ্যানথ্যানে জেলির মতো পদার্থ মাটির ওপর লেপটে থাকত। এই থ্যানথ্যানে পদার্থের যে-অংশ ধুলোবালি থেকে মুক্ত থাকত, আমরা বাচ্চারা সেটুকু অত্যন্ত আরাম করে খেতাম। ভারি মিষ্টি, তার ওপর অকালের আম। মাঝে মাঝে আমাদের বরাত খুলে যেত। বাতাসে ছোটখাটো ডাল আমসহ ভেঙে পড়ত। তখন আমরা আম খাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতাম। প্রতি বছর কিন্তু ডাল-ভাঙানো হাওয়া বইত না। সুতরাং বেশির ভাগ সময়ে মেঘের কাছাকাছি পাকনা আমের দিকে তাকিয়ে খাওয়ার স্বাদ মেটাতে হত। গাছটা এত উঁচুতে যে বলবান মানুষটিও ঢিল ছুড়ে আমের কাছাকাছি পাঠাতে পারত না। রান্নাঘরের চালার ওপরে যে শাখাটি মোচড় খেয়ে একেবারে হঠাৎ আকাশের দিকে উঠে গেছে, তাতেই ফলত স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় বিরাট বিরাট লোভনীয় সিঁদুরে সব আম। অত উঁচুতে চড়ার সাহস কোনো গাছিরই হত না। সুতরাং আষাঢ়ে গাছটিকে আম পাকিয়ে পাখির জন্য অপেক্ষা করতে হত। আম পাকতে শুরু করলে নানা জাতের পাখি গাছটিতে ভিড় করত। সারাদিন কাকের কা কা শব্দে কান পাতা দায় হত। রাতের বেলা দলে দলে বাদুড়েরা আসত। আমাদেরই আমগাছ অথচ ফল খাওয়ার অধিকার পেয়েছে পাখপাখালির দল। কোনো কোনো দরদি পাখি আমাদের মতো বাচ্চাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে একেবারে ঠোঁট না-বসানো দুয়েকটি আম নিচে ফেলে দিত। সেই পাখিদের আমরা খুব ভালোবাসতাম। আমার বড় একটা বোন ছিল তার গায়ের রং ছিল কালো। কাকদের মন গলানোর জন্য সে চমৎকার করে ছড়া উচ্চারণ করত :

অ কাউয়া তুইও কালা মুইও কালা
আম ফেলারে দলা দলা।

আমগাছের একেবারে উঁচু ডালটিতে একটি শঙ্খচিল পরিবার বাসা করে থাকত। দুপুরবেলা আকাশে যখন শঙ্খচিল চক্কর দিত, সোনালি ডানায় রোদ লেগে ঝিলমিল করে উঠত।

এই প্রাচীন বৃক্ষটির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আকাশের কাছাকাছি তার অবস্থান, ডালে শঙ্খচিলের বাসা, আষাঢ় মাসের পাকনা আম—সবকিছু একযোগে আমার হৃদয় মন হরণ করে নিয়েছিল। এই বৃক্ষের সংসারের প্রতি বিস্ময়-মিশ্রিত নয়নে তাকাতাম। যতই তাকাতাম অনুভব করতাম, এই বৃক্ষের বিহঙ্গকুলের সংসারে আমিও একটা স্থান করে নিতে পেরেছি এবং বৃক্ষটিও সেটা বুঝতে পারে। দাদু নাতির সম্পর্কের মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় এবং স্নেহের স্থান আছে আমার সঙ্গে বৃক্ষের সেরকম একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। আমি ভাবতে থাকতাম বিরাট সংসারসহ এই বিশাল বৃক্ষটি একান্ত আমার। তার শাখায় যে আম দোলে সেগুলো আমার। যেসব পাখি আসে, যেসব পাখি বাসা করে বাস করে সব আমার। আমি ছোট্ট হাত দিয়ে বৃক্ষের কাণ্ডটা আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু বৃক্ষটা এত প্রকাণ্ড যে দুহাতে তাকে বেড় দেয়া যায় না। কী করে গাছটাকে একেবারে আপন করে নেব ভেবে কূল পেতাম না।

একদিন স্কুল থেকে আসার সময় একটা সুন্দর ভাবনা আমার মাথায় খেলে গেল। যদি একটি নতুন নাম দিয়ে ফেলি, বৃক্ষটি পুরোপুরি আমার হয়ে যাবে। তখন আর কারো দখল থাকবে না। তখন রবি ঠাকুরের ছড়া কবিতা মুখস্থ করছিলাম। বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান/আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে/ তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। কত রকমের ছড়া, যখনই পড়ি মনে একটা মিষ্টি ঝংকারের রেশ অমনিই সঞ্চারিত হয়। মনে মনে ভাবলাম আম গাছটির নাম রবিবৃক্ষ রাখলে বেশ হয়। রবি ঠাকুরের কবিতা মিষ্টি এই গাছের আমও মিষ্টি। রবি ঠাকুরকে দাড়িতে চুলে গোঁফে মনুষ্য জঙ্গলের মতো দেখায়, এই গাছটির সঙ্গেও তাঁর একটা সুন্দর মিল পাওয়া যাবে।

আমি খাতার একটি পাতা ছিঁড়ে কাঠের কলমের গোড়াটা কালিতে চুবিয়ে লিখে ফেললাম, আজ হইতে আষাঢ়ে আমগাছের নাম বদল করিয়া রবিবৃক্ষ রাখা হইল। সকলে এই গাছকে রবিবৃক্ষ ডাকিবেন। না ডাকিলে শাস্তি হইবে। নিচে লিখলাম বাই অর্ডার আ-হ-ম-দ-ছ-ফা। বাই অর্ডার শব্দটা অন্য জায়গা থেকে ধার করেছি। একবার থানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি একটা সাইনবোর্ড লেখা আছে, এই পুকুরে কেহ গোসল করিবেন না। নিচে লেখা আছে বাই অর্ডার থানা কর্তৃপক্ষ। কাগজটা জিগর গাছের আঠা দিয়ে ভালো করে সেঁটে দিলাম। তারপর জনমত গঠন করতে লেগে গেলাম। আমার ছোট বোনকে বললাম, এই আজ থেকে আষাঢ়ে গাছকে রবিবৃক্ষ ডাকবি। সে বলল, কেন? আমি বললাম, আমার হুকুম। তারপর সে মুখ ভেঙচে বলতে থাকল, তোমার আবার হুকুম। আষাঢ়ে আমগাছ, আষাঢ়ে আমগাছ চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল। মুখের ওপর আপন বড় ভাইকে যে-বোন অমন অপমান করতে পারে, সে কি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়? আমি তার গালে একটা চড় লাগাতেই সে চিৎকার করে এমন কান্না জুড়ে দিল যে মা-বাবা দুজনেই বাড়ি থেকে ছুটে এল। কাঁদছ কেন জিগগেস করায় তার কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল। তারপর আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ও আমাকে মেরেছে। কেন মেরেছে? সে জবাব দিল, কয় কি আষাঢ়ে আম গাছটিকে আগডুমবাগডুম কী একটা নামে ডাকতে হবে। গাছটাকে একটা মনোমতো নাম দিয়ে একান্ত নিজের করে পাওয়ার প্রথম প্রয়াসটিই বিশ্বাসঘাতক বোনের ষড়যন্ত্রে

বানচাল হয়ে গেল। আমাদের ওদিকে ঘনঘন সাইক্লোন হয়। চৈত বৈশাখ এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে জোরে হাওয়া বইলে আমার বাপ এবং বড় ভায়ের চোখে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে ওঠে। আষাঢ়ে আমগাছটা যদি ভেঙে পড়ে আমাদের থাকার মাটির ঘর এবং রান্নাঘর নির্ঘাত চাপা পড়ে যাবে। এমনকি আমাদের জ্যাঠার বাড়িও নিরাপদ নয়। অনেকেই গাছটা কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে। আমার বাবা কাটিকাটি করেও গাছটি কাটতে পারেননি। গাছটি কেটে ফেলার কথা তুললেই আমি কেঁদেকেটে একাকার করে ফেলতাম। আমার মা বাড়ির পুরুষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতেন না। আমি যখন খুব কান্নাকাটি করতাম আমার মা কাউকে কিছু না বলে ভাত পানি খাওয়া বন্ধ করে দিতেন। মা-ছেলের যৌথ প্রতিরোধের মুখে তিন তিনবার গাছিকে আমার বাবা ডেকে ফেরত পাঠিয়েছেন।

আমার মায়ের বাবার বাড়িতে কেউ নেই। তাই মা মামার বাড়িতে গিয়ে বাবার বাড়ির সাধ মেটাতেন। আমাদের আদরযত্নে যাতে ঘাটতি না পড়ে সেজন্য মামাবাড়ি থেকে মা তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তি কখনো দাবি করেননি। মা সেবার মামাতো ভায়ের বিয়ে উপলক্ষে মামার বাড়ি গেলেন। সঙ্গে করে আমাকে এবং বোনকে নিয়ে গেলেন। সেখানে সাত-আট দিন ছিলাম। মায়ের মামাবাড়ি থেকে ফেরার সময় আধ মাইল দূর থেকে তাকিয়ে দেখি আমাদের বাড়িটা খালি খালি দেখা যাচ্ছে। কী একটা যেন নেই। কাছে এসে দেখলাম আমার সেই রবিবৃক্ষ কেটে খণ্ডখণ্ড করে ফেলা হয়েছে। আমি কথা বলতে পারলাম না। বোবা হয়ে বসে রইলাম। আমার বুকে সেই যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত পৃথিবী ক্যাপসুল করে ঢুকিয়ে দিলেও সে ফাঁক ভরাট হবে না। সকলে এখন ওজোন স্তর ফুটো হওয়ার আশঙ্কা করে। কিন্তু আমার মনের ওজোন স্তর কবে যে ফুটো হয়ে গিয়েছে সে খবর কেউ কি রাখে?

একদিন দুপুরবেলা সুশীল নীলক্ষেতের চিড়িয়াঅলার কাছ থেকে একটা ঝুঁটি-শালিকের বাচ্চা কিনে নিয়ে এল। সে পাখিটাকে এনেছিল একটি ঠোঙার ভেতর করে। অবশ্য কটা ফুটো করে দিয়েছিল। দেখে আমি ভীষণ রেগে গেলাম। এমন করে কেউ কি পাখি আনে।

শালিকের বাচ্চাটিকে দেখে আমি খুশি এবং বেজার দুইই হলাম। খুশি হলাম এই কারণে যে একেবারে বাচ্চা বয়সে আমি একটা শালিক পুষেছিলাম। পাখিটি পোষ মেনেও গিয়েছিল। খাঁচায় রাখার প্রয়োজন হত না। পাখিটি যথা ইচ্ছে ঘুরে বেড়াত। আবার ঠিকই সন্ধেবেলা ফিরে এসে নিজে নিজে খাঁচায় ঢুকে যেত। আমার মা আফিম খেতেন। পাখিটাকেও কলার ভেতর করে নিয়মমাফিক আফিম খাওয়াতেন। দীর্ঘদিন কলার মধ্যে আফিমের লোভে ঘরে ফিরত, নাকি পোষ মেনেছে বলে সন্ধেবেলা খাঁচায় এসে ঢুকত বলা মুশকিল। এই পাখিটা যখন মারা যায় শোকে এক সপ্তাহ আমি ঘুমোতে পারিনি। এই পাখিটিকে আমি মরা মানুষকে যেমন কবর দেয়া হয়, তেমনি কবর দিয়েছিলাম। অনেকদিন একা একা পাখিটির কবরের পাশে বসে থাকতাম। পাখিটির মৃত্যুই হল আমার শিশুবয়সের প্রথম শোক। শালিক পাখি আমার মনে এমন একটা

জায়গা করে নিয়েছে, যে-কোনো জায়গায় শালিক দেখলে একটা আত্মীয়তার ভাব আপনিই জেগে উঠত। সেজন্য সুশীল নিজে থেকেই যখন একটা শালিক নিয়ে এল, আমার মনে হল বহুকাল আগের মরে যাওয়া শালিকটিই আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে। আমার খুশি হয়ে ওঠার এটাই কারণ। হারানো ইউসুফ আবার কেনানে ফিরে এসেছে।

এখন বেজার হলাম কেন সেই কারণটা খুলে বলি। আমি ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে থাকার সময়ে পাখি ফিরি করে বেড়ায় এরকম একজনের কাছ থেকে একটি টিয়া কিনেছিলাম। বাচ্চা না বুড়ো বোঝার উপায় ছিল না। পাখিবিক্রেতারা ভয়ংকর ধড়িবাজ। অনেক সময় বাচ্চা বলে ধাড়ি পাখি গছিয়ে দিয়ে থাকে। পাখিটি কেনার পরই আমার চোখে পড়ল পাখা দুটো কেটে দেয়া হয়েছে। আগে জানলে এই পাখি আমি কিনতাম না বরং পাখিবিক্রেতাকে পিটিয়ে দিতাম। পাখা কেটে দেয়ার মতো নিষ্ঠুর কাজ যে-পাখিবিক্রেতা করে, তার শাস্তি হওয়া উচিত।

আমার কেনা পাখিটি একচোটে পাঁচ সাত হাতের বেশি উড়তে পারত না। অন্তত একদিক থেকে নিশ্চিত হয়েছিলাম যে পাখিটি উড়েটুড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। খাঁচা একটি কিনেছিলাম বটে, কিন্তু পাখিটিকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে রাখতাম। টিয়ে কোনোদিন পোষ মানে না এরকম শুনে আসছি। কিন্তু আমার পাখিটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কিছুদিন না-যেতেই পাখিটি ভালোমতো পোষ মেনে গিয়েছিল। সে সময় আমি অনেকটা বাউলের জীবন যাপন করতাম। আমার মাথায় দীর্ঘ বাবরি চুল ছিল। কাঁধ ছাপিয়ে পিঠে এসে পড়ত। আমি বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় পাখিটিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে টিয়েসুলভ কর্কশ কণ্ঠে প্রতিবাদ করত। পাখিটিকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হতাম। তখন গায়ে সব সময় একটা চাদর রাখতাম। চাদরের একটা অংশ পাখিটার দিকে বাড়িয়ে দিলে চাদর বেয়ে বেয়ে টিয়েটা ওপরে এসে ঠিক আমার কাঁধের ওপর আসন নিত। আমি যত দূরেই যাই না কেন পাখিটা আমার কাঁধে বসে থাকত। কোনো বাড়িতে গেলে, পাকা মরিচ না পাওয়া গেলে কাঁচামরিচ চেয়ে নিয়ে পাখিটাকে দিতাম। পাখিটা ধারালো ঠোঁটে কচকচ করে মরিচ খেত। কখনো ঠোঁটের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে এমন জোরে চেপে ধরত যে আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত। পাখিটার কারণেই আমি ঢাকা শহরে দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছিলাম। কোনো অচেনা পাড়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চারা আমার পিছু নিত আর আমাকে পাখিঅলা ফকির ডাকত। আমার দিঘল চুল, গায়ের চাদর, তার ওপর কাঁধে একটা টিয়ে—অনায়াসে ফকির হিসেবে মানিয়ে যেত। পাখিটাকে উপলক্ষ করে আমার একটা নতুন পরিচয় ছড়িয়ে পড়ছে, সেই জিনিসটি আমার মন্দ লাগত না। রাতে আমি যখন ঘুমোতাম টিয়েটা আমার চুলের ভেতর পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ঝুলে ঘুমোত। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমি সারা গায়ে পাখি পাখি গন্ধ পেতাম। পাখিটিকে আমি পাখি নামেই ডাকতাম। পাখিটা ঘরের কোনাকানচির মধ্যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকত। পাখি বলে ডাক দিলে টে টে টে জাতীয় শব্দ করে বেরিয়ে আসত। পাখিটা দিনে দিনে আমার সত্তার অংশ হয়ে উঠেছিল। পাখিটি ছাড়া কিছুতেই আমার চলত না।

একদিন দুপুরবলা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভুলবশত দরোজাটা খোলা রেখে দিয়েছিলাম। সন্ধেবেলা যখন ঘুম ভাঙল, দেখি পাখি নেই। পাখি পাখি করে অনেকবার ডাকলাম। কিন্তু একবারও সাড়া পেলাম না। আমার মনে নানারকম আশঙ্কা দোলা দিতে থাকল। তা হলে পাখিটিকে কি কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে? আমার পাখিটার প্রতি এক মালয়েশিয়ান মহিলার নজর ছিল। নানা জায়গায় খোঁজ করলাম। ধারেকাছে নিচু নিচু যত গাছ আছে সবগুলোতে তালাশ করলাম। কোথাও পাখির দেখা পেলাম না। আমি মালয়েশিয়ান ছাত্রটির কাছে যেয়ে জিগগেস করলাম তার বান্ধবী কোথায় থাকে? সে জানাল তার বান্ধবী দুমাস হয় কুয়ালালামপুর চলে গেছে। তখন আমার মনে ভয়টা গাঢ় হয়ে উঠল। তা হলে পাখিটি কি হুলো বেড়ালের পেটে চলে যায়নি? ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে অনেকগুলো লেজঝোলা হুলো ঘোরাফেরা করত। কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গমকালীন চিৎকারে রাতের ঘুম ভেঙে যেত। আমার দুরুম পরে থাকতেন কালীপদ সেন। তাঁর ঘরের সামনে নানা ভাঙাচোরা জিনিসের একটা স্তূপ হয়ে পড়েছিল। ভাঙা ঝাড়ু, ফুটো কেতলি, ছেঁড়া জুতো, বাচ্চার ফেলে-দেয়া খেলনা। কী ছিল বলা মুশকিল। আমি তো পাখি পাখি চিৎকার করে হোস্টেল মাথায় করেছি। কোথাও পাখিটির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। হোস্টেলের মহিলারা, বিশেষ করে তাঁদের বাচ্চারা আমার পাখিটাকে খুব ভালোবাসত। নানা সময়ে তারা পাখিটার সঙ্গে খেলত। আমার সঙ্গে বাচ্চারাও পাখিটার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

আমি কৌতূহলবশত কালীপদ সেনের ঘরের সামনের ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের স্তূপে টর্চের আলো ফেলে পাখি বলে ডাক দিলাম। মনে হল কিছু একটা নড়ে উঠেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমার পাখিটাই থরথর করে কাঁপছে। আমি দুহাত দিয়ে তাকে বের করে এনে দেখি সবুজ পালকগুলো রক্তে ভিজে গেছে। নিশ্চয়ই কোনো হারামি বেড়াল তার শরীরে থাবা বসিয়েছে। পাখিটাকে নিয়ে আমি ফুলবাড়িয়ার পশুপক্ষীর হাসপাতালে ছুটলাম। দারোয়ান জানাল রাতের বেলা কোনো ডাক্তার থাকে না। দারোয়ানের কাছে ঠিকানা নিয়ে সোবহানবাগ ডাক্তারের বাড়িতে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম, ডাক্তার তাঁর জেঠাসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন।

আমি আধমরা পাখিটি নিয়ে অগত্যা হোস্টেলে ফিরে এলাম। কিছুই করার ছিল না। পাখিটাকে দুহাতের ওপর রেখে ডাকতে লাগলাম, পাখি। পাখিটি থরথর করে কাঁপছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমার বুকেও কাঁপন জাগছে। এভাবে আধারাত কখন পার হয়েছে টের পাইনি। একসময়ে পাখিটার সারা শরীর নড়ে উঠল। তার ডান পাটা একটা হ্যাঁচকা টানে লম্বা হয়ে গেল। গলা থেকে ক্যাঁক করে অস্ফুটে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। তারপর পাখিটার হৃদয়স্পন্দন থেমে গেল। আমার দুহাতে নিষ্প্রাণ পাখির পালকগুলো খসখস করছে। আমি যেন পাথর হয়ে বসে রইলাম। তার পর থেকে পাখি পোষার প্রতি আমার একটা বৈরাগ্য জন্মে গেছে। সুশীলের শালিকটা দেখে পুরোনো শোক উথলে উঠেছিল। তাই আমি বেজার হয়ে উঠেছিলাম। যে পাখি পোষে, তার মনে অবশ্যই ধারণা থাকে, পাখি দাগা দিয়ে মারা যাবে অথবা পালিয়ে যাবে।

আমাদের ঘরে একটি প্লাস্টিকের খোপ খোপ ঝুড়ি ছিল। দেখতে বেশ খাঁচার মতো। তাকে আমরা আপাতত তার ভেতরে রাখলাম। পাখিটা এই ঝুড়ির স্বল্প

জায়গা করে নিয়েছে, যে-কোনো জায়গায় শালিক দেখলে একটা আত্মীয়তার ভাব আপনিই জেগে উঠত। সেজন্য সুশীল নিজে থেকেই যখন একটা শালিক নিয়ে এল, আমার মনে হল বহুকাল আগের মরে যাওয়া শালিকটিই আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে। আমার খুশি হয়ে ওঠার এটাই কারণ। হারানো ইউসুফ আবার কেনানে ফিরে এসেছে।

এখন বেজার হলাম কেন সেই কারণটা খুলে বলি। আমি ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে থাকার সময়ে পাখি ফিরি করে বেড়ায় এরকম একজনের কাছ থেকে একটি টিয়া কিনেছিলাম। বাচ্চা না বুড়ো বোঝার উপায় ছিল না। পাখিবিক্রেতারা ভয়ংকর ধড়িবাজ। অনেক সময় বাচ্চা বলে ধাড়ি পাখি গছিয়ে দিয়ে থাকে। পাখিটি কেনার পরই আমার চোখে পড়ল পাখা দুটো কেটে দেয়া হয়েছে। আগে জানলে এই পাখি আমি কিনতাম না বরং পাখিবিক্রেতাকে পিটিয়ে দিতাম। পাখা কেটে দেয়ার মতো নিষ্ঠুর কাজ যে-পাখিবিক্রেতা করে, তার শাস্তি হওয়া উচিত।

আমার কেনা পাখিটি একচোটে পাঁচ সাত হাতের বেশি উড়তে পারত না। অন্তত একদিক থেকে নিশ্চিত হয়েছিলাম যে পাখিটি উড়েটুড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। খাঁচা একটি কিনেছিলাম বটে, কিন্তু পাখিটিকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে রাখতাম। টিয়ে কোনোদিন পোষ মানে না এরকম শুনে আসছি। কিন্তু আমার পাখিটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কিছুদিন না-যেতেই পাখিটি ভালোমতো পোষ মেনে গিয়েছিল। সে সময় আমি অনেকটা বাউলের জীবন যাপন করতাম। আমার মাথায় দীর্ঘ বাবরি চুল ছিল। কাঁধ ছাপিয়ে পিঠে এসে পড়ত। আমি বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় পাখিটিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে টিয়েসুলভ কর্কশ কণ্ঠে প্রতিবাদ করত। পাখিটিকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হতাম। তখন গায়ে সব সময় একটা চাদর রাখতাম। চাদরের একটা অংশ পাখিটার দিকে বাড়িয়ে দিলে চাদর বেয়ে বেয়ে টিয়েটা ওপরে এসে ঠিক আমার কাঁধের ওপর আসন নিত। আমি যত দূরেই যাই না কেন পাখিটা আমার কাঁধে বসে থাকত। কোনো বাড়িতে গেলে, পাকা মরিচ না পাওয়া গেলে কাঁচামরিচ চেয়ে নিয়ে পাখিটাকে দিতাম। পাখিটা ধারালো ঠোঁটে কচকচ করে মরিচ খেত। কখনো ঠোঁটের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে এমন জোরে চেপে ধরত যে আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত। পাখিটার কারণেই আমি ঢাকা শহরে দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছিলাম। কোনো অচেনা পাড়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চারা আমার পিছু নিত আর আমাকে পাখিঅলা ফকির ডাকত। আমার দিঘল চুল, গায়ের চাদর, তার ওপর কাঁধে একটা টিয়ে—অনায়াসে ফকির হিসেবে মানিয়ে যেত। পাখিটাকে উপলক্ষ করে আমার একটা নতুন পরিচয় ছড়িয়ে পড়ছে, সেই জিনিসটি আমার মন্দ লাগত না। রাতে আমি যখন ঘুমোতাম টিয়েটা আমার চুলের ভেতর পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ঝুলে ঘুমোত। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমি সারা গায়ে পাখি পাখি গন্ধ পেতাম। পাখিটিকে আমি পাখি নামেই ডাকতাম। পাখিটা ঘরের কোনাকানচির মধ্যে মাঝে মাঝে লুকিয়ে থাকত। পাখি বলে ডাক দিলে টে টে টে জাতীয় শব্দ করে বেরিয়ে আসত। পাখিটা দিনে দিনে আমার সত্তার অংশ হয়ে উঠেছিল। পাখিটি ছাড়া কিছুতেই আমার চলত না।

একদিন দুপুরবেলা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভুলবশত দরোজাটা খোলা রেখে দিয়েছিলাম। সন্ধেবেলা যখন ঘুম ভাঙল, দেখি পাখি নেই। পাখি পাখি করে অনেকবার ডাকলাম। কিন্তু একবারও সাড়া পেলাম না। আমার মনে নানারকম আশঙ্কা দোলা দিতে থাকল। তা হলে পাখিটিকে কি কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে? আমার পাখিটার প্রতি এক মালয়েশিয়ান মহিলার নজর ছিল। নানা জায়গায় খোঁজ করলাম। ধারেকাছে নিচু নিচু যত গাছ আছে সবগুলোতে তালাশ করলাম। কোথাও পাখির দেখা পেলাম না। আমি মালয়েশিয়ান ছাত্রটির কাছে যেয়ে জিগগেস করলাম তার বান্ধবী কোথায় থাকে? সে জানাল তার বান্ধবী দুমাস হয় কুয়ালালামপুর চলে গেছে। তখন আমার মনে ভয়টা গাঢ় হয়ে উঠল। তা হলে পাখিটি কি হুলো বেড়ালের পেটে চলে যায়নি? ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে অনেকগুলো লেজঝোলা হুলো ঘোরাফেরা করত। কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গমকালীন চিৎকারে রাতের ঘুম ভেঙে যেত। আমার দুরুম পরে থাকতেন কালীপদ সেন। তাঁর ঘরের সামনে নানা ভাঙাচোরা জিনিসের একটা স্তূপ হয়ে পড়েছিল। ভাঙা ঝাড়ু, ফুটো কেতলি, ছেঁড়া জুতো, বাচ্চার ফেলে-দেয়া খেলনা। কী ছিল বলা মুশকিল। আমি তো পাখি পাখি চিৎকার করে হোস্টেল মাথায় করেছি। কোথাও পাখিটির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। হোস্টেলের মহিলারা, বিশেষ করে তাঁদের বাচ্চারা আমার পাখিটাকে খুব ভালোবাসত। নানা সময়ে তারা পাখিটার সঙ্গে খেলত। আমার সঙ্গে বাচ্চারাও পাখিটার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

আমি কৌতূহলবশত কালীপদ সেনের ঘরের সামনের ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের স্তূপে টর্চের আলো ফেলে পাখি বলে ডাক দিলাম। মনে হল কিছু একটা নড়ে উঠেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমার পাখিটাই থরথর করে কাঁপছে। আমি দুহাত দিয়ে তাকে বের করে এনে দেখি সবুজ পালকগুলো রক্তে ভিজে গেছে। নিশ্চয়ই কোনো হারামি বেড়াল তার শরীরে থাবা বসিয়েছে। পাখিটাকে নিয়ে আমি ফুলবাড়িয়ার পশুপক্ষীর হাসপাতালে ছুটলাম। দারোয়ান জানাল রাতের বেলা কোনো ডাক্তার থাকে না। দারোয়ানের কাছে ঠিকানা নিয়ে সোবহানবাগ ডাক্তারের বাড়িতে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম, ডাক্তার তাঁর জেঠাসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন।

আমি আধমরা পাখিটি নিয়ে অগত্যা হোস্টেলে ফিরে এলাম। কিছুই করার ছিল না। পাখিটাকে দুহাতের ওপর রেখে ডাকতে লাগলাম, পাখি। পাখিটি থরথর করে কাঁপছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমার বুকেও কাঁপন জাগছে। এভাবে আধারাত কখন পার হয়েছে টের পাইনি। একসময়ে পাখিটার সারা শরীর নড়ে উঠল। তার ডান পাটা একটা হ্যাঁচকা টানে লম্বা হয়ে গেল। গলা থেকে ক্যাঁক করে অস্ফুটে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। তারপর পাখিটার হৃদয়স্পন্দন থেমে গেল। আমার দুহাতে নিষ্প্রাণ পাখির পালকগুলো খসখস করছে। আমি যেন পাথর হয়ে বসে রইলাম। তার পর থেকে পাখি পোষার প্রতি আমার একটা বৈরাগ্য জন্মে গেছে। সুশীলের শালিকটা দেখে পুরোনো শোক উথলে উঠেছিল। তাই আমি বেজার হয়ে উঠেছিলাম। যে পাখি পোষে, তার মনে অবশ্যই ধারণা থাকে, পাখি দাগা দিয়ে মারা যাবে অথবা পালিয়ে যাবে।

আমাদের ঘরে একটি প্লাস্টিকের খোপ খোপ ঝুড়ি ছিল। দেখতে বেশ খাঁচার মতো। তাকে আমরা আপাতত তার ভেতরে রাখলাম। পাখিটা এই ঝুড়ির স্বল্প

আয়তনের মধ্যে হাঁটাচলা করতে গিয়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। আধারাতে পাখিটার দিকে তাকিয়ে দেখি, পাখার মধ্যে মুখ গুঁজে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মনে হল পাখিটি কাঁদছে। পরদিন সকালে সুশীলকে বললাম বাজার থেকে একটা বড়সড় খাঁচা নিয়ে এসো। সুশীল মাঝারি সাইজের একটি খাঁচা নিয়ে এল। এই খাঁচাটি আগেরটির চাইতে বড়। কিন্তু চলাফেরায় পাখির পাখিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি বললাম, সুশীল এই খাঁচাটিও চলবে না। বাজারের সবচাইতে বড় খাঁচাটি নিয়ে এসো। সুশীল এমন একটা প্রকাণ্ড খাঁচা নিয়ে এল যাতে অনায়াসে একটা মানুষ শুয়ে থাকতে পারে। পাখিটিকে যখন বড় খাঁচায় চালান করা হল, সমস্ত পাখি-ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে লাফালাফি করতে থাকল। কখনো দাঁড়ের ওপর ওঠে, কখনো নিচে নামে। খাঁচার ফাঁক দিয়ে বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসলে অন্য পাখিদের ওড়াউড়ি দেখলে খাঁচার ভেতর তার ছটফটানি বাড়তে থাকে। খাঁচার এপাশ থেকে ওপাশে পাখায় ভর করে উড়তে গিয়ে ধাক্কা খায়। আশাভঙ্গের বেদনা এবং শারীরিক ক্লান্তি যখন তাকে কাবু করে ফেলে, সে দাঁড়ের ওপর বসে চিন্তা করে, কোথায় এসেছি। দাঁড়ের ওপর বেশিক্ষণ বসে থাকা তার পোষায় না। সে ছাতুর বাটিটাতে নিচু হয়ে ঠোকর বসাতে থাকে। দুতিনটা ঠোকর দিয়ে পানির বাটির দিকে সরে যায়। ঠোঁট ডুবিয়ে পানি তুলে নিয়ে মাথাটা বাঁকিয়ে সে যখন পানি গেলে কী অপূর্ব সুন্দর দেখায়। এই খাওয়াদাওয়ার সময়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও তার মন থেকে উদার আকাশে অন্যান্য পাখির মতো ওড়াউড়ির স্বপ্ন তিরোহিত হয়ে যায়। সে একটা সুখী পাখির মতো দাঁড়ের ওপর গিয়ে বসে। পাখাটা ঝাড়া দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। আসল যা আকার তখন শালিকটিকে তার চাইতে অনেক বড় দেখায়। তার গলার নিচের অংশটা ফুলে ওঠে এবং সে ডাকতে আরম্ভ করে। তার প্রথমদিকের আওয়াজগুলো ধাতুতে ধাতুতে ঘষা লাগার মতো কর্কশ এবং সাপের ফোঁস করে ওঠার মতো তীক্ষ্ণ শোনায়। শালিকের এই ধরনের ডাক বাতাস ভেদ করে ছুঁচোলো তীরের মতো ছুটে যায়। পরের দিকে তার কণ্ঠ থেকে একধরনের ভাঙা ভাঙা কোমল চিকন স্বর বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই স্বরগুলো এতই কোমল যে হৃৎপিণ্ডের গতিতে ধাবমানতা সৃষ্টি করতে পারে। পাখিটির দুঃখের গান শেষ হলে সে ঠোঁট দিয়ে পাখায় খোঁটাতে থাকে। মনে হয় পিঁপড়ে, ছোট্ট কীট ইত্যাদি টেনে টেনে বের করে।

পাখিটির পুরো জীবনবৃত্তান্ত আমার জানা নেই। চিড়িয়াঅলা কার কাছ থেকে কিনেছে, কতদিন তার দোকানে ছিল এসব তথ্য মোটেই জানায়নি। আমার অনুমান করতে কষ্ট হয় না আগে ছোট্ট পরিসরে অন্যান্য পাখির বাচ্চাদের সঙ্গে নিতান্ত আড়ষ্ট জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছে। আমার মনে হয়, তবু তার একধরনের সান্ত্বনা ছিল। সে একা নয়, অন্য পাখির বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে আলাপেসালাপে বন্দিজীবন যাপন করতে কষ্টটা অত লাগত না। এই এক চিলতে দোকানের মধ্যে শত শত বন্দি পাখি জীবন কাটায়। শালিকটি ধরে নিয়েছিল, এটাই পাখিদের নিয়তি এবং এক চিলতে দোকানটুকুই পাখিদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

আমরা খাঁচাটা প্রশস্ত ছাদের একপাশে স্থাপন করেছি। প্রতিদিন সে বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে দেখে দূরের আকাশে সোনালি থলকমলের মতো সূর্য বেরিয়ে আসছে। সূর্য যতই আলোক ছড়ায়, বিশাল আকাশটা ছুটে এসে তার খাঁচায় আঘাত করে। আকাশের ডাক

তার মর্মকেন্দ্রে গিয়ে বাজে। সে স্থির থাকতে পারে না। লোহার নিষ্ঠুর খাঁচার প্রতিটি ফাঁকের কাছে এসে দৃষ্টি বাড়িয়ে দেখতে পায়, তারই মতো পাখাঅলা পাখির দল আকাশে গতির স্পন্দন জাগিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তখন তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটা তীব্র হয়ে ওঠে। শরীরের প্রতিটি পালক উড়াল দেয়ার প্রয়াসে স্ফীত হয়ে যায়। কিন্তু লোহার খাঁচা পথ দেয় না। দুঃখে অপমানে রাগে তার কণ্ঠ দিয়ে ধাতু ধাতুতে ঘষা লাগার মতো, সাপের হিসহিস হুংকারের মতো কর্কশ তীক্ষ্ণ কর্ণভেদী আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে। খাঁচার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে যখন নালিশের ভাষা নিস্তেজ হয়ে আসে, তার কণ্ঠ থেকে কোমল দুঃখের গান, বন্দিজীবনের গান ভাঙা ভাঙা সুরে ঝরে পড়তে থাকে।

তিন রকমের শালিক আছে। একটি প্রজাতি হল গাঙশালিক। শাদা কালোতে মেশানো পাখা। ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ায়। ঝগড়াটে মানুষের মতো সর্বক্ষণ চিৎকার করে। খায় না এমন জিনিস দুনিয়াতে নেই। অন্য অনেক বস্তুর মধ্যে মনুষ্যমলের প্রতি গাঙশালিকের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। শুধু গাঁওগেরামে নয়, শহরেও যেখানে গাছপালা আছে গাঙশালিকেরা বাস করতে আপত্তি করে না। কবি জীবনানন্দ দাশ যে রোঁয়া-ওঠা প্রজাতির শালিকের রূপে মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছেন, সেটা ভাতশালিক। এরা সব সময় মানুষের ধারেকাছে বাস করে। গ্রাম শহরের কোনো বালাই নেই। তাই বলে বনেজঙ্গলে বাস করে না, একথাও ঠিক নয়। ভাতশালিক উড়াল দেয়ার সময় পাখার স্পন্দন থেকে একটা মধুর শব্দ বেরিয়ে আসে। সংগীতে পকড় লাগাবার সময় যে শব্দাংশের মধ্যে কণ্ঠস্বরের তড়িৎ বিচ্ছুরিত হয় অনেকটা সেরকম। এই প্রজাতির শালিক দেখতে অন্য প্রজাতির চাইতে একটু বড়। গায়ের রং মেটে লাল।

সুশীল যে শালিকটা কিনে এনেছে, সেটাকে বলা হয় ঝুঁটিশালিক। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মাথার ওপর একটা ঝুঁটি শোভা পায়। কোথাও কোথাও এই প্রজাতির শালিককে চন্দন শালিকও বলা হয়। পশুদের মধ্যে সুন্দর পশু অনেক আছে। কিন্তু ঘোড়ার পা, মাথা, গ্রীবা, পিঠ, লেজ সমস্ত প্রত্যঙ্গ নিয়ে এমন একটা সুমিতি, অঙ্গ-সংস্থানের এমন নিপুণ পারিপাট্য, অন্য পশুর মধ্যে সেটা কদাচিৎ দেখা যায়। ঘোড়া যখন ঘাড় বেঁকিয়ে দীর্ঘ কদমে চলে, তার শরীর থেকে যে ছন্দ ঝরে পড়ে, সেটাই শিল্পীদের বারবার ঘোড়ার ছবি আঁকতে প্ররোচিত করেছে। বস্তুত এমন বড় শিল্পী খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি জীবনে অন্তত একটি ঘোড়ার ছবি আঁকেননি।

ঝুঁটিশালিককে আমি সবচাইতে সুন্দর পাখি বলব এমন দুঃসাহস আমার নেই। পাখিবিশারদদের বিরাগভাজন হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই। তবু আমি বলব এটি এক অপূর্ব সুন্দর পাখি। সারা শরীরের গড়নটাই এত সুমিত যে একবার দৃষ্টি দিলে ফেরানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন লেজ, তেমন পেট। গলার দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। আবার মাথাটা একটু বড়। পায়ের রং ফিকে হলদে এবং ঠোঁটটা একেবারে কাঁচা হলুদের মতো। ঠোঁটের সঙ্গে মাথা এবং মাথার ওপর চোখ এমনভাবে বসানো হয়েছে একটা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের আভাস ঝিলিক দিতে থাকে। চোখ দুটো কালো পুঁতির মতো, তাতে একটু শুভ্রতার আমেজ। সেই কারণে একটা টলটলানো আভা বিকিরিত হতে থাকে। ঝুঁটিশালিকের সবচাইতে সুন্দর জিনিস হল তার গায়ের রং। দেখামাত্রই প্রাণের ভেতর ছাপ পড়ে যায়। ছাইয়ের সঙ্গে কয়লা গুঁড়ো করে মেশালে যে রং হয়,

অবিকল সেরকম। এই রংকে কি মিশকালো বলা যাবে? পাখিটি যখন ছুটোছুটি করে মিশকালোর ভেতর থেকে একটা শাদাটে আভা বেরিয়ে আসে, এই আভাটুকুই তার আসল আকর্ষণ।

আমাদের শালিকটি খাঁচায় অবিরাম ছুটোছুটি করে, কখনো ওপরে ওঠে, কখনো নিচে নামে, কখনো দাঁড়ে বসে খ্যাপা চিৎকার করে, কখনো দুঃখের গান গায়, কখনো পাখা ঝাড়া দিয়ে পালকগুলো প্রসারিত করে, পাখার ভেতর ঠোঁট বুজে থাকে, হলুদ ঠোঁট খাঁচার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে আকাশের স্বাদ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। পাখিটির দুঃখের এই অভিব্যক্তিগুলো আমার চোখে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। তাই পাখিটাকে কিনে এনে খাঁচায় বন্দি করেছি। পাখিটির সঙ্গে জোর করে প্রণয়সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ভিতরেও একটা নাম-না-জানা পাখি অবিরাম পাখা ঝাপটাচ্ছে। আসল ব্যাপার ভুলে থাকি বলে টের পাইনে। চিনতে পারো, নাকি, রে মন বুঝতে পারো নাকি, তোমার পিঞ্জিরায় থাকে অচেনা এক পাখি। বাউল গানের কলি মন ফুঁড়ে জেগে ওঠে। মানুষের আত্মাকে তো বারবার পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই পাখিটির অবিরাম ছুটোছুটির মধ্যে আমি আমার গহনচারী আত্মার অভিসারের ছায়া প্রত্যক্ষ করে স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে থাকি।

পাখিটি খাঁচার ভেতর হাঁটাচলা করত, একদণ্ডের জন্যও তার বিরাম নেই। আমি তাকে ডাকতাম শালিক পাখি, মানিক পাখি, কালো পাখি, ভালো পাখি, হলুদ পাখি, মলুদ পাখি, যত ভালো ভালো নাম আসে সব নামেই ডাকতাম। পাখিটি ছুটোছুটি করার ফাঁকে একবার আমার দিকে তাকাত। আমার ভেতরেও যে একটি পাখি আছে শালিকটি কি বুঝত? আলাওল মনে করতেন, মনুষ্য শব্দ শ্রবণ করলে পাখির মনেও মনুষ্য জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। পদ্মাবতী কাব্যে লিখেছেন হীরামন শুক জান তার প্রিয় পাখি, শুনিয়া মনুষ্যশব্দ হৃদে হল আঁখি। আমার পাখিটির হৃদয়েও কি চোখ জন্মাচ্ছে?

একদিন সুশীল পাখিটিকে শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করাল। গায়ের মিশকালো রঙের সঙ্গে হলুদের রং মিশে এমন একটা নয়নশোভন বরন পেয়েছে দেখে চোখ ফেরাতে পারলাম না। পাখিটিকে যত দেখি আরো দেখতে ইচ্ছে হয়। আমার ঘরে মিসেস নওশাদ তাঁর দুটি বাচ্চাসহ এসেছিলেন। বাচ্চা দুটো পাখিটা দেখে ভীষণ মজে গিয়েছিল। পাখিটি না নিয়ে যাবে না বলে মায়ের কাছে আবদার এবং জেদ প্রকাশ করছিল। ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের শান্ত করার জন্য বললেন, বাড়ি যাওয়ার পথেই পাখিঅলার কাছ থেকে একটা পাখি কিনে তাদের দেবেন। বাচ্চারা বলল ওইরকম পাখিই কিনে দিতে হবে, অন্য পাখি নয়। তখনই মিসেস নওশাদ আমার পাখিটার দিকে তাকালেন এবং অবাক হয়ে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন এই পাখি বাচ্চাদের খেলার পাখি নয় শুধু, আরো অতিরিক্ত কিছু পাখিটার রয়েছে। তিনি আমাকে জিগগেস করলেন, এত সুন্দর পাখি কোথায় পেলেন, কী নাম পাখিটার? আমি মজা করার জন্য বললাম, পাখিটা ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ থেকে আনিয়েছি। নাম সুবান্দ্রম। মহিলা বললেন, নামটা সংস্কৃত সংস্কৃত মনে হচ্ছে না? আমি বললাম, অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়াতে একসময়ে ভারতীয়েরা উপনিবেশ তৈরি করেছিল।

তার পর থেকে আমাদের একটা খেলার নেশা পেয়ে বসল। বালতিতে একেক ধরনের রং গুলে পাখিটাকে একেকদিন গোসল করাতাম। কোনোদিন নীল, কোনোদিন সবুজ, কোনোদিন বেগুনি, মিশকালো রঙের সঙ্গে এমন এক বরন পেয়ে যেত, কিছুতেই শালিক বলে চেনা যেত না। মানুষজন যখন জানতে চাইত কী পাখি আমি একেকদিন একেক পরিচয় দিতাম। কখনো বলতাম ভেনিজুয়েলা থেকে আমার এক বান্ধবী এই পাখি আমার কাছে পাঠিয়েছে। এই ধরনের পাখি পাওয়া যায় উরুগুয়ের জঙ্গলে। লোকে আমার বান্ধবীভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করত। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত, বলতাম, এই পাখির আসল নিবাস আফ্রিকার কিলিমাঞ্জোরো পর্বতের চূড়োয়।

শালিকটি আমার দিন আমার রাত আমার অবসর এমনভাবে ভরিয়ে রেখেছিল কীভাবে দিন আসে, কী করে রাত হয় কিছুই খেয়াল থাকত না। আমার চেতনার সবটুকু আয়তন পাখিটা দখল করে নিয়েছিল। স্বপ্নেও আমি পাখি পাখি বলে ডেকে উঠতাম। বাড়িতে অভ্যাগত কেউ এলে এমন উচ্ছ্বসিত আবেগে পাখির কথা বয়ান করতাম, বন্ধুবান্ধবেরা বিরক্ত হয়ে আমার বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন সুশীল বালতিতে রং গুলে গোসল করাতে লেগেছে, অসতর্ক মুহূর্তে পাখিটা একটা লম্বা উড়াল দিয়ে সামনের পাঁচতলা বাড়ি, ইলিট্রিক পোস্ট, য়্যুক্যালিপটাস গাছের মাথার ওপর দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। আমি ভেতরে ভেতরে জানতাম, পাখি একদিন দাগা দিয়ে পালিয়ে যাবে।

পাখিটা চলে যাওয়ার পর থেকেই আমার বুকের একটা পাশ কেবলই খালি খালি মনে হতে লাগল। বুকের ভেতরের কিছু বাতাস এমনভাবে বেরিয়ে গেছে, যেন সেখানে একটি ফাঁক তৈরি হয়েছে। শূন্য খাঁচাটি যখন চোখে পড়ত, এই ফাঁকটির কথা বেশি করে অনুভব করতাম। খাঁচার ভেতরে ছাতুর বাটিটি তেমনি রয়েছে, পানির ভাঁড়টি এখনো পানিতে টলটল করছে। কিছুতেই মন মানতে চাইত না, থাকা খাওয়ার এমন পাকা ব্যবস্থা, এর সবকিছু ছেড়ে পাখিটি একেবারে চলে গেছে, এটা কী করে সত্যি হতে পারে? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত, পাখিটি একটু ঘুরেটুরে আবার খাঁচায় এসে বসবে, ছাতুতে ঠোকর বসাবে, মাথা নিচু করে পানির ভাঁড়ে ঠোঁট ঠেকাবে। তারপর গান করবে। আমার এত আদর, এত সোহাগ এত ভালোবাসা সবকিছু পায়ে ঠেলে পাখিটি কি এমনিভাবে উড়ে যেতে পারে? ঘুম থেকে উঠে দুয়ার খোলা ফাঁকা খাঁচাটি যখন দেখি, আমার ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। আমার ভেতরে যে পাখি আছে তার পাখার ধুকপুক ধ্বনি আমি শুনতে পাই।

একদিন সকালবেলা দেখলাম আমার শালিকটিই সামনে পাঁচতলা দালানের শিকের ওপর ম্লান মুখে বসে আছে। আমার কেমন জানি বিশ্বাস হল, পাখিটি আমাকে একেবারে ভুলে যায়নি। আমি ডাকলাম, বাবু, বাবু। আমার ডাক যেই শুনেছে তক্ষুনি লম্বা উড়াল দিয়ে পাঁচতলা দালান ছাড়িয়ে, য়্যুকালিপটাস গাছের ওপর দিয়ে, ইসকাটনের দিকে কোথায় উড়ে গেল ঠাহর করতে পারলাম না। তার পরদিন থেকে পাখিটিকে নানা জায়গায় দেখতে থাকলাম। কখনো পাঁচতলা দালানের লোহার শিকে, কখনো নোনাগাছটির মাথায়, কখনো নারকোল গাছে। একবার তো আমার জানালার পাশের আমগাছের আগডালে এসে বসেছিল। সকাল-দুপুর-বিকেল সব সময়ে দেখি

পাখিটি বাড়ি-পালানো ছেলের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেবল আমার গলার আওয়াজটি শুনলেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়।

আমার বাড়ির চারপাশে পাখিটি ঘুরে বেড়াচ্ছে একেবার একা একা। এখনো সঙ্গীসাথি জুটিয়ে নিতে পারেনি। তাকে যে-রঙে ছুপিয়ে গোসল করিয়েছিলাম এই এতদিনেও তার পাখা থেকে যায়নি। আমার ধারণা জন্মাল এই আলগা রঙের কারণেই সে স্বজাতি শালিকদের সঙ্গে মিশে যেতে পারছে না। এটাই তার একা একা ঘুরে বেড়াবার কারণ। আরো একটা কথা আমার মনে এল। জন্মের পর থেকেই শালিকটি বন্দিজীবন কাটাচ্ছে। খাবার জোগাড় করার কথা তাকে ভাবতে হয়নি। এখন সে স্বাধীন জীবনে খাবার সংগ্রহ করতে পারছে না। খাবার সংগ্রহ করার শিক্ষা তার কোনোদিন হয়নি। পেটের ক্ষুধাটা যখন তীব্র হয়ে ওঠে, পূর্বস্মৃতির জেরবশত সে আমার বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

আমি একটা কাজ শুরু করলাম। পাখিটাকে যখনই ধারেকাছে কোথাও দেখি তার দৃষ্টিতে পড়েমতো ছোট ছোট দলা পাকিয়ে ছাদের নানা জায়গায় ছাতু ছড়িয়ে দিতে থাকলাম। ভাতও ছুড়ে দিলাম। সে যদি ইচ্ছে করে ছাতু খেতে পারে। আবার ভাত পছন্দ করলে ভাতও খেতে পারে। একদিন নটার সময় দেখলাম পাখিটি একেবারে ছাদের দেয়ালে এসে বসেছে। ইচ্ছে হলে দুগজ নিচে নেমে খাবারে মুখ বসাতে পারে। তখন ঘরে কেউ ছিল না। আমি ভ্যান্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পাখিটি এদিক-ওদিক ভালো করে তাকাচ্ছে, বিপদের কোনো আশঙ্কা আছে কি না। একসময়ে মুখ হাঁ-করা খাঁচাটির দিকে যখন তার চোখ গেল অমনি উড়াল দিয়ে চলে গেল। আমি সেদিনই সন্ধেবেলা দেলোয়ারকে খবর দিলাম তার বাচ্চা রথীসহ যেন আসে। রথী বেশ কদিন থেকেই খাঁচাসহ পাখিটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদার ধরছিল। এখন পাখি নেই, রথী শূন্য খাঁচাটি নিয়ে যেতে পারে। বাপ ব্যাটা এসে খাঁচাটি নিয়ে গেল।

আমি মনে মনে পাখিটির উদ্দেশে বললাম, এখন তো আর খাঁচা নেই। সুতরাং খাবারটুকু খেয়ে যেতে তো তোমার আপত্তি হওয়ার কথা নয়। তার পরদিন সকালবেলা কোত্থেকে সুরমা রঙের একটা গেরোবাজ কবুতর এসে গোটা ছাদে পল্টনের ঘোড়ার মতো বুক ফুলিয়ে ছড়িয়ে দেয়া খাবার খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। আমি মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে, শালিকের ব্যাটা এবার বুঝুক, সে না খেলেও খাবার পড়ে থাকবে না। অনেক লোক আছে। তার পরদিন থেকে সকালবেলা গেরোবাজটি আসতে থাকল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আনোয়ার কী একটা ফাঁদ পেতে গেরোবাজটিকে ধরে ফেলল। অন্য সময় হলে এই বিরল প্রজাতির কবুতরটিকে আটকে রেখে দিতাম, কিন্তু শালিকটি উড়ে যাওয়ার পর থেকে বাঁধাবাঁধি থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেছে। ছেড়ে দিলাম গেরোবাজটিকে। গেরোবাজ আর কোনোদিন আসেনি। তার বদলে দুটি মামুলি পোষা কবুতর রুটিন করে আসতে থাকল। আমি মনে মনে বললাম, আমি কী বোকা! শালিকটার জন্য আমি ছাদময় খাবার ছড়াচ্ছি, কবুতর এসে সে খাবার খেয়ে যাচ্ছে। আমার চাইতেও শালিকটিকে অধিক বোকা মনে হতে থাকল। তোমার যদি আমার দেয়া খাবারে অরুচিই হয়ে থাকে, ধারেকাছে এমন করে ঘুরে বেড়াও কেন? দূরেটুরে

এমন কোথাও চলে যাও, যাতে আমি তোমাকে দেখতে না পাই। আর আমারও ছুটি হয়ে যায়।

একদিন সকালবেলা দেখি দুটি রাজঘুঘু এসে আমার ছাদে ঠুকে ঠুকে খাবার খাচ্ছে। ঘুঘু অতিশয় সতর্ক পাখি। মানুষের কাছাকাছি থাকলেও মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবু ফাঁদে পড়ে যায়। কারণ ফাঁদে পড়াই ঘুঘুপাখির নিয়তি। রাজঘুঘু অত্যন্ত সুন্দর পাখি। গলার কাছটিতে ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটি মালা। সেই গলাটা ফুলিয়ে যখন ডেকে ওঠে, মনে হয় স্মৃতির গহনে কিছু একটা পাশ ফিরছে। এইবার শালিকের ব্যাটার ওপর আমি একটা শোধ তুলতে পেরেছি। আমার কি পাখির অভাব আছে, এই তো রাজঘুঘুরা আসতে শুরু করেছে। তুমি না খাও তো আমার বয়ে গেল। আকাশে কি পাখির কমতি আছে? তারা আমার ছড়িয়ে দেয়া খাবারের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে।

এইভাবে শালিকের ব্যাটাকে সাধ্যসাধনা করতে গিয়ে প্রায় পনেরো দিন পার হয়ে গেল। একদিন দেখি এক মজার কাণ্ড। খুব সকালবেলা তুলসী গাছের ফাঁকটিতে দেখি কী একটা নড়াচড়া করছে। খুব সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি একটি শালিক—আমার সেই শালিকটি। আমার মনে হল এতদিনে আমার মানবজনম সার্থক হল। শালিকের ব্যাটা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। আমি তো এইই চেয়েছিলাম। আমি খাবার ছড়িয়ে রাখব, শালিকের ব্যাটা এসে খেয়ে যাবে। খুব ভোরে আমি খাবার ছড়িয়ে রাখি। পাখিটি এক ফাঁকে এসে খেয়ে চলে যায়। কোনোদিন তার চেহারা দেখি, কোনোদিন দেখতে পাইনে।

শালিকের সঙ্গে আমার যে একটি গোপন বন্দোবস্ত হয়েছে, দুটো পাজি কাক কী করে সেই জিনিসটি টের পেয়ে গেছে। আমার খাঁচায় কিছুদিন কারাবাস করেছিল বলেই পেনশনস্বরূপ সব খাবার একা একা খেয়ে যাবে, কাকেরা তা মোটেই মানতে রাজি নয়। আমি খাবার দেয়ার পরেই তিন চারটি কাক শূন্য থেকে আমার ছাদে এসে নামে এবং নির্লজ্জের মতো শালিকের বরাদ্দ খাবার খেয়ে ফেলতে থাকে। শালিকটি কাছাকাছি এলে তাড়িয়ে একেবারে পগার পার করে দিয়ে আসে। আমি পড়ে গেলাম মহা মুশকিলে। কাকদের তাড়িয়ে কূল পাওয়া যায় না। তিনটা কাক তাড়ালে পাঁচটা কাক আসে। পাঁচটা তাড়ালে দশটা আসে। প্রতিদিন ভোরবেলা কাকদের সঙ্গে আমার একটা লড়াই শুরু হয়ে যায়। আমি যখন কাক তাড়াতে থাকি, ভয় পেয়ে শালিকের ব্যাটাও পালিয়ে যায়। আমাকে ভয় পাওয়ার অভ্যেস তার কাটেনি। কাকদের যদি না তাড়াই, কাকরাই শালিকের বাচ্চাটিকে ঢাকা শহরের অপর প্রান্ত অবধি ছুটিয়ে নিয়ে যায়। কাকের মতো অমন ত্যাঁদড় পাখি আর হয় না। তারা সকালে দুপুরে সাঁঝে কা কা করে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলল। এই কাকদের নিয়ে কী করব আমি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। একটা যদি বন্দুক থাকত কাকদের উচিত শাস্তি দিতে পারতাম। সেটা যখন নেই, দৌরাত্ম্য সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কী। একদিন দুপুরবেলা দেখলাম আমার ছাদের দেয়ালের ওপর বসে আছে একটি কাক যার একটি পা মোচড়ানো, সেজন্য বেচারিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। আমার মায়া লেগে গেল। কিছু ভাত তার জন্য ছাদে ছড়িয়ে দিলাম। সে নিচে নেমে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কাক এসে চিৎকারে আমার ছাদ মাথায় করে তুলল। কাকেরা আজব জাতের পাখি। আরেকজনকে

ঠকিয়ে খেতে যেমন কাকের জুড়ি নেই, তেমনি তাদের সামাজিক ঐক্যের বন্ধনটিও অত্যন্ত জীবন্ত। একটি কাক যখন ফাঁদে ধরা পড়ে কিংবা বিদ্যুতের তারে আটকে যায়, তামাম দুনিয়ার যত কাক আছে, চিৎকার করে বন্দির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে থাকে।

এই কাকেরা আমার একটি দুর্বলতার বিষয় জেনে গেছে। খোঁড়া কাকটির প্রতি আমার বিশেষ ধরনের টান রয়েছে। তাই আর কাকেরা খোঁড়াকে তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। খোঁড়া ছাদের দেয়ালে বসে অবিরাম ডেকে যাবে। একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে কিছু খাবার যখন ছুড়ে দিই তার স্ত্রীপুত্র-ভাই-বেরাদর-বন্ধুবান্ধব সব এসে আমার ছাদে জুটে যাবে। এই সময়ের মধ্যে খোঁড়া আমার কাছ থেকে খাবার আদায় করার অনেকগুলো কৌশল শিখে ফেলেছে। প্রথমে সে চিৎকার করে জানায় তার পেটে খিদের সঞ্চার হয়েছে। আমি যদি তার চিৎকারে কান না দিই কাচের জানালায় এসে ঠোকরাতে থাকবে। এই খোঁড়া কাকটির পাল্লায় পড়ে আমি বুঝতে পারছি, গাঁওগেরামে কানা খোঁড়া ওদের রসুলের দুশমন মনে করা হয় কেন। আমার ঘরে যখন অতিথি মেহমান থাকে, খোঁড়া দেয়ালে বারবার ঠোঁট ঘষতে থাকে। বাইরের লোকদের কাছে আমাকে অপদস্থ করার জন্যই খোঁড়া এই কাজটি করে। অর্থাৎ সে জানায় তার খুব খিদে পেয়েছে, আমি তাকে কিছু খেতে না দিয়ে খুব অন্যায় কর্ম করছি। বাইরের লোকদের কাছে আমার কৃপণ পরিচয়টি প্রকাশ করার জন্যই খোঁড়া এই টেকনিকটা প্রয়োগ করে। বাইরের লোকদের কাছে মুখরক্ষার জন্য হোক কিংবা তার ত্যাঁদড়ামিতে বিরক্ত হয়ে হোক কিছু খাবার যখন ছুড়ে দিই, সে তার কাকের ভাষায় গেয়াত গোষ্ঠী সবাইকে ডাকতে থাকে। অবশ্য খোঁড়ার একটি ভালো গুণের কথা আমাকে কবুল করতে হবে। সন্ধেবেলা আমি বাইরে থেকে না আসা পর্যন্ত সে দেয়ালের ওপর বসে থাকে। এই কাজটি যে সে আমার প্রতি মমতাবশত করে সে ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।

কাকেরা যে-রকম বেকায়দায় ফেলে থাকে আমি তাদের সঙ্গে যে-করেই হোক সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে ফেলার কথা চিন্তা করেছি। আজকাল গলিতে গলিতে কাটা রাইফেল, পাইপগান এসব পাওয়া যাচ্ছে। কিছু টাকা ফেললেই তার একটা ভাড়া হিসেবে পাওয়া যায়। লাশ ফেলতে হবে না, দুয়েকটা আওয়াজ করলেই কাকেরা আর এ বছর এমুখো হবে না। কিন্তু গণ্ডগোল ঠেকেছে গিয়ে এক জায়গায়। রাইফেলের আওয়াজ করে যদি কাকদের আসা বারণ করি, অন্য পাখিদের আসাও বন্ধ হয়ে যায়। আমি যদি চাই রোজ সকালে আমার শালিকটি আসবে, তা হলে আকাশের সব পাখি যারা এখানে আসতে চায় তাদের সকলকে আতিথেয়তা দেয়ার জন্য আমাকে রাজি থাকতে হবে। সব প্রজাতির পাখির মধ্যে যতই প্রজাতিগত বিরোধ থাকুক না কেন, সকলে একটা বিষয়ে একমত। এক প্রজাতির পাখি যেখানে নিরাপদ নয়, কোনো প্রজাতির পাখির জন্য সেটা আদর্শ বিচরণস্থল হতে পারে না।

কাকদের অনেক দুর্নাম শুনেছি। কিন্তু অত্যন্ত কাছে থেকে ঘাঁটপিটা করতে গিয়ে যেটুকু জেনেছি, এই পাখিটির আসল জীবন সম্পর্কে মানুষ খুব অল্পই জানে। লোকমুখে শুনে কিংবা বই পড়ে পাখিটিকে গালাগাল করে থাকে। গলার স্বরটা একটু কর্কশ বটে,

কিন্তু একটু কানখাড়া শুনলেই তার ভেতর একটা চিকন রেশ পাওয়া যাবে। কেন যে পাখিটিকে নোংরা পাখি বলে আমি তো তার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। ভদ্রলোকদের অনেক গুণই কাকের আছে, খেয়েই ঠোঁট মুছে ফেলবে। যখনই পানি পাওয়া যায়, চট করে গা ধুয়ে ফেলবে। গা ধোওয়ার ব্যাপারে তার শীত গ্রীষ্ম বাছবিচার নেই। পুরুষ কাক নিজের মুখের খাবারটা যেভাবে খেয়ে বান্ধবীর ঠোঁটে ঢুকিয়ে দেয় সেটা শুধু দেখবার নয়, অনুভব করারও ব্যাপার।

কাকেরা আকাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাদের বাদ দিয়ে ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে পিরিত রাখার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অন্য যত পাখি আসুক আমি খাবার জোগাব। কিন্তু একটা জায়গায় শক্ত অবস্থান গ্রহণ করলাম। সকালে প্রথম খাবার পাওয়ার অধিকার আমার শালিকের। এই সময়টিতে অন্য যে-কোনো পাখি, সে যদি পাখিদের রাজাও হয়, যদি আসে আমার কাছ থেকে ঢিল, লাঠি এবং গালাগাল ছাড়া কিছুই আদায় করতে পারবে না। অন্য পাখিদের বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, পালিয়ে যাওয়া শালিকটির সুবাদেই তারা আমার কাছ থেকে এমন আদরযত্ন আদায় করে নিতে পারছে। সুতরাং তাদের মেনে নিতে হবে আমার ছাদে এসে প্রথম খাবার খাবে শালিক। মানুষের নিয়ম কি পাখিদের সমাজে চালু করা যায়? কিন্তু আমি শক্ত হয়ে রইলাম। দুদিন সকালবেলা একেবারে কাকদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলাম। কাকদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হতে দেখে শালিকটিও পালাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল, না এসে উপায় কী? পেটে তো খিদে আছে।

সকালবেলা আমার বন্ধু ইদ্রিস নাশতা করার জন্য ডিমের সঙ্গে হাতেবেলা চারটি রুটি দিয়ে থাকে। তার মধ্যে দুটি রুটি খেয়ে বাকি দুটি হাতে নিয়ে, কাকমণ্ডলী, শব্দটি উচ্চারণ করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রুটি ছড়াতে থাকি। খাবার দেখে কাকেরা আণ্ডা বাচ্চা বুড়োবুড়িসহ ছুটে আসতে থাকে। খাওয়ার পাট শেষ হলে আমার যে একটি পিতলের ঘণ্টা আছে, সেটি বাজিয়ে দিই। দুচার দিন না যেতেই পাভলভিয়ান রিফ্লেক্স কাকদের মধ্যেও কাজ করতে থাকে। কাকমণ্ডলী শব্দটি উচ্চারণ করে ডাক দিলে দলে দলে কাকেরা ছুটে আসে। আর ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে চলে যায়। কাকের কথা এখনো ফুরোয়নি। তার আগে আমার আদরের শালিকটির কিছু সংবাদ পরিবেশন করা প্রয়োজন।

এই এতদিনে শালিকটির গায়ের রং স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তার মানে অন্য শালিকদেরও তাকে আর শালিক বলে চিনতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। মনুষ্যসহবাসের চিহ্নটুকু মুছে যাওয়ার নগদ লাভ এই হয়েছে যে সে একটা বান্ধবী জুটিয়ে নিতে পেরেছে। আমার পাখিপুত্রটি একটি বউ জুটিয়ে নিতে পেরেছে দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হল। মেয়েটি নেহাত পাখি বলেই আমি খাইখরচের দায় থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম। নইলে শাড়ি গয়নার জোগান দিতে গিয়ে আমার অনেক টাকা বেরিয়ে যেত। শালিকটি প্রতি সকালে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বউটিকে নিয়ে জোড় বেঁধে আসে। সরাসরি সে ছাদে নেমে আসে না। জানালার পাশের আমগাছটির ঘন শাখার ফাঁকে ফাঁকে হাওয়া চলাচল করার মতো ছুটোছুটি করে। প্রথমে সেই ধাতব কর্কশ

শব্দটি উচ্চারণ করে জানিয়ে দেয়, শ্রীমান সস্ত্রীক এসে গেছে। তারপর কোমল ভাঙা ভাঙা স্বরগুলো ঝরতে থাকে। আমাকে ভাত কিংবা চাউল নজরে পড়েমতো ছড়িয়ে দিয়ে অনেক সাধাসাধি করতে হয়। বাবু আমার, মানিক আমার। তার পরেও কি শালিক খেতে আসে। আমাকে সরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ফুড়ুত করে আমার শালিকটি দেয়ালের ওপর বসে শালিকের মাতৃভাষায় বউ-পাখিটিকে ডাকে। অন্য পাখিটি এলে চারদিক খুব ভালো করে তাকিয়ে ছাদে নামে। দেখাদেখি বউটিও নেমে আসে অত্যন্ত সন্তর্পণে। তারপরে দুটিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাল কিংবা ভাত খুঁটে খায়। একচোটে সব খাবার শেষ করা তার ধাতে নেই। মাঝখানে আমগাছের ডালে বসে সে এবং তার বউ শালিকের বোলচাল চালাত। আমি যথাসম্ভব তার কণ্ঠস্বরের নকল করে জবাব দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভোঁতা মনুষ্য বাকযন্ত্র থেকে অমন চিকন শালীন কোমল শব্দ বের হবে কেমন করে। যেদিন শালিক এবং তার বউয়ের মেজাজ ভালো থাকত, ছাদে নেমে এসে ঠুকে ঠুকে খাবার খেত। আর মেজাজটি যেদিন খাট্টা থাকত পাশের বাড়ির ছাদের কোনার দিকের ঝাঁকড়া দারুচিনি গাছটিতে বসে কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকত। আমার মনে হত শালিক দুটি আমাকে কষে গালাগাল করছে। বেলা যখন বারোটা একটা বাজে, সূর্য মাথার ওপর এসে থির হয়ে দাঁড়ায়, পাখি দুটো জোড় বেঁধে আবার ছাদে খাবার খেতে আসে। বেলা তিনটের সময় আবার আসে। আমাকে তিনবার খাবার ছড়িয়ে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে আস্ত একটা শালিকের দঙ্গল চিৎকার করে ছাদে এসে নামে। খাবার খেয়ে আবার উড়ে চলে যায়। আমি এতদিনে একটুখানি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম, আমার পাখিপুত্রটি তার আপন শালিকসমাজে গৃহীত হয়েছে। পাখির সমাজে প্রায়শ্চিত্ত এবং ঘুসঘাসের নীতি চালু আছে কি না জানা নেই। তবে আমি ধরে নিয়েছি আমার পুত্রটি তার মনুষ্যপিতার ছড়িয়ে দেয়া খাবারের লোভ দেখিয়েই হয়তো শালিকসমাজের সদস্যপদ কিনে নিয়েছে। মাঝে মাঝে শালিকটি একেবারে একাকী আমার ছাদে আসে। সঙ্গে বউটিও থাকে না। দেয়ালে বসে ডাকাডাকি করে। আমার মন আনন্দে আটখানা হয়ে যেতে চায়। আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার পাখিপুত্র আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময় করার জন্যই এমনিভাবে একাকী আসে। পাখিপুত্রটি আমার কথা স্মরণ রেখেছে। এর বেশি আমি কী চাইতে পারি।

একদিন বেলা এগারোটার সময় দেখলাম, ছাদের দেয়ালে দুটি বুলবুলি বসে আছে। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। শহরে এর আগে কখনো বুলবুলি দেখেছি মনে পড়ে না। দেখলেও মনে রেখাপাত করেনি। বুলবুলির গায়ের রং খয়েরি বলা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ পাখির গায়ের রঙের মধ্যে বিশেষ একটির প্রাধান্য, তবে আরো নানা রঙের স্থূল সূক্ষ্ম বুনন জড়িয়ে থাকে। বুলবুলির মেটে গায়ের রংকে আমি বললাম খয়েরি। অন্য মানুষ অন্য কথা বলতে পারে। তাতে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না। বুলবুলির মাথায় ঝুঁটি আছে। মেয়ে বুলবুলি পুরুষের চাইতে বোধ হয় সামান্য খাটো। বুলবুলির লেজটি যেখানে শুরু হয়েছে তার ঠিক নিচু অংশে লাল রঙের যে বলয়টি রয়েছে সেখানেই বুলবুলির আসল সৌন্দর্য। এই লালকে কোন ধরনের লাল বলা যেতে পারে আপাতত সেটি নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বুলবুলির এই পেছনের দিকের লাল অংশটিতে এমন একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি আছে, দেখামাত্রই মনের ভেতর চেপে বসে যায়।

বইপত্রে পড়ে আসছি বুলবুলি গানের পাখি। কারো গলার আওয়াজ মিঠে এবং সুরেলা হলেই অন্য সবাই বলে থাকে বুলবুলের মতো মিষ্টি স্বর। শুনে আসছি ইরান দেশ গান, গোলাপ এবং বুলবুলির দেশ। কোনো কবি কোনো গায়ক কিংবা গায়িকা এমনকি মিলাদ পড়ানোর মওলানাকেও সমাজে বুলবুল পরিচয় লাভ করতে দেখা যায়। কিন্তু বুলবুলির গানটি কেমন? আমি নিজে জানিনে। ছোটবেলায় বুলবুলির বাসা ভেঙে বাচ্চা লুট করেছি, কিন্তু কণ্ঠের স্বরটি কেমন কান পেতে শোনার অবকাশ হয়নি। অনেককেই জিগগেস করেছি, বুলবুলির আওয়াজটি কেমন? কেউ বলতে পারেনি। অথচ সকলে একমত বুলবুলি গানের পাখি। এখানেই বইয়ে পড়া ধারণা ও শোনা কথার সঙ্গে আসল জিনিসের ফারাক।

এইবার প্রথম বুলবুলির গান শুনলাম। বুলবুলি একনাগাড়ে অধিকক্ষণ গান করে না। খাবারে ঠোকর দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে তার ঠোঁট থেকে এমন এক-একটা স্বর ঝরে পড়ে সেটাকে পাহাড়ি ঝরনা বয়ে যাওয়ার সময় পানির প্রবাহের সঙ্গে তলার পাথরের ঘষা লেগে যে নরম ভেজা শব্দখণ্ড সৃষ্টি হয়, একমাত্র তার সঙ্গে তুলনা চলে। বুলবুলির ঠোঁট থেকে আরো কিছু খণ্ডখণ্ড শব্দ বেরিয়ে আসে, হারমোনিয়ামের কোমল ঋষভ এবং কোমল গান্ধারের সঙ্গে সেগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যেতেও পারে। এটা আমার কষ্টকল্পনামাত্র। বুলবুলির স্বর বুলবুলিরই মতো।

আমি পাখিপুত্রটির কাছে অনেক ঋণে ঋণী। সে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করেছে। পাখির কণ্ঠের বৈচিত্র্য শুনে অনুভব করতে পারি, এখনো মানুষের ভাষা কতদূর সীমিত। কতকিছুই আমি জানতাম না। আমার জানালার পাশের আমগাছটিতে যে দশ-বারোটি বুলবুলি স্থায়ীভাবে বাসা করে থাকে, তার কিছুই আমি জানতাম না। এখন সকালবেলা দরোজা খুললেই দেখি আমার ডাইনে বাঁয়ের বাড়িগুলোর দেয়ালে, গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি ছুটোছুটি করছে। এতকাল চোখ বন্ধ করে ছিলাম কেমন করে।

একদিন যখন বিকেলের তেজ মরে এসেছে, খুবই অনায়াস ভঙ্গিতে উত্তরদিক থেকে একটা দোয়েল উড়ে এল। তার শাদা কালো পাখায় রোদের ঝলক লেগে ঝকঝক করছে। পাখিটি উড়ে এসে পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেয়া চাল খুঁটে খেতে লাগল। দানা খাওয়ার ভঙ্গি করে লাফিয়ে লাফিয়ে গোটা ছাদটাই জরিপ করে ফেলল। তারপর একলাফে গিয়ে দেয়ালের ওপর বসে শিস দিতে থাকল। এমন কোমল স্বর ঘনায়মান সন্ধের ফিকে ফিকে অন্ধকারের ভেতর এমন একটা জাদু রচনা করে, তার স্পর্শে সমস্ত বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। এই পাখিটিই বোধ করি পাশের দালানের শিকের ওপর বসে থেকে মসজিদের আজান হওয়ার পূর্বে, মোরগ ডাকার অনেক আগে থেকে লম্বা লম্বা শিস দিয়ে প্রভাতের ঘুম ভাঙানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওপাশের জলপাই গাছে বসে যে দোয়েলটি শিস দেয় ওটি বোধ হয় তার জোড়া। এদিকে ওদিকে, নিকটে দূরে এত দোয়েল ডাকতে থাকে কোনটা কার জোড়া কে বলতে পারে। যে মনোযোগ দিয়ে রাত্রিশেষের দোয়েলের শিস তন্ময় হয়ে শোনে একমাত্র তারই মনে হবে, দোয়েলেরা কণ্ঠস্বরের রসায়ন গাঢ় জমাটবাঁধা আঁধারকে ফিকে করে আনছে। রাত্রিশেষে দোয়েল যে শিস দেয়, সকালবেলা সেই শিস দেয় না। স্বরতরঙ্গের ওঠানামার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে

টি উচ্চারণ করে জানিয়ে দেয়, শ্রীমান সস্ত্রীক এসে গেছে। তারপর কোমল ভাঙা
া স্বরগুলো ঝরতে থাকে। আমাকে ভাত কিংবা চাউল নজরে পড়েমতো ছড়িয়ে
য় অনেক সাধাসাধি করতে হয়। বাবু আমার, মানিক আমার। তার পরেও কি
নক খেতে আসে। আমাকে সরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ফুড়ুত করে আমার শালিকটি
ালের ওপর বসে শালিকের মাতৃভাষায় বউ-পাখিটিকে ডাকে। অন্য পাখিটি এলে
দিক খুব ভালো করে তাকিয়ে ছাদে নামে। দেখাদেখি বউটিও নেমে আসে অত্যন্ত
র্পণে। তারপরে দুটিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাল কিংবা ভাত খুঁটে খায়। একচোটে সব
ার শেষ করা তার ধাতে নেই। মাঝখানে আমগাছের ডালে বসে সে এবং তার বউ
লকের বোলচাল চালাত। আমি যথাসম্ভব তার কণ্ঠস্বরের নকল করে জবাব দিতে
া করতাম। কিন্তু ভোঁতা মনুষ্য বাকযন্ত্র থেকে অমন চিকন শালীন কোমল শব্দ বের
া কেমন করে। যেদিন শালিক এবং তার বউয়ের মেজাজ ভালো থাকত, ছাদে নেমে
ন ঠুকে ঠুকে খাবার খেত। আর মেজাজটি যেদিন খাট্টা থাকত পাশের বাড়ির ছাদের
নার দিকের ঝাঁকড়া দারুচিনি গাছটিতে বসে কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে
কত। আমার মনে হত শালিক দুটি আমাকে কষে গালাগাল করছে। বেলা যখন
রাটা একটা বাজে, সূর্য মাথার ওপর এসে থির হয়ে দাঁড়ায়, পাখি দুটো জোড় বেঁধে
য়ার ছাদে খাবার খেতে আসে। বেলা তিনটের সময় আবার আসে। আমাকে তিনবার
ার ছড়িয়ে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে আস্ত একটা শালিকের দঙ্গল চিৎকার করে ছাদে
ন নামে। খাবার খেয়ে আবার উড়ে চলে যায়। আমি এতদিনে একটুখানি নিশ্চিন্ত
ত পারলাম, আমার পাখিপুত্রটি তার আপন শালিকসমাজে গৃহীত হয়েছে। পাখির
াজে প্রায়শ্চিত্ত এবং ঘুসঘাসের নীতি চালু আছে কি না জানা নেই। তবে আমি ধরে
য়ছি আমার পুত্রটি তার মনুষ্যপিতার ছড়িয়ে দেয়া খাবারের লোভ দেখিয়েই হয়তো
লকসমাজের সদস্যপদ কিনে নিয়েছে। মাঝে মাঝে শালিকটি একেবারে একাকী
ার ছাদে আসে। সঙ্গে বউটিও থাকে না। দেয়ালে বসে ডাকাডাকি করে। আমার
আনন্দে আটখানা হয়ে যেতে চায়। আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার পাখিপুত্র আমার
ঃ ব্যক্তিগত কুশল বিনিময় করার জন্যই এমনিভাবে একাকী আসে। পাখিপুত্রটি
ার কথা স্মরণ রেখেছে। এর বেশি আমি কী চাইতে পারি।

একদিন বেলা এগারোটার সময় দেখলাম, ছাদের দেয়ালে দুটি বুলবুলি বসে
ছ। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। শহরে এর আগে কখনো বুলবুলি দেখেছি মনে
ড় না। দেখলেও মনে রেখাপাত করেনি। বুলবুলির গায়ের রং খয়েরি বলা যেতে
র। কিন্তু অধিকাংশ পাখির গায়ের রঙের মধ্যে বিশেষ একটির প্রাধান্য, তবে আরো
া রঙের স্থূল সূক্ষ্ম বুনন জড়িয়ে থাকে। বুলবুলির মেটে গায়ের রংকে আমি বললাম
রি। অন্য মানুষ অন্য কথা বলতে পারে। তাতে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।
বুলির মাথায় ঝুঁটি আছে। মেয়ে বুলবুলি পুরুষের চাইতে বোধ হয় সামান্য খাটো।
বুলির লেজটি যেখানে শুরু হয়েছে তার ঠিক নিচু অংশে লাল রঙের যে বলয়টি
য়ছে সেখানেই বুলবুলির আসল সৌন্দর্য। এই লালকে কোন ধরনের লাল বলা যেতে
রে আপাতত সেটি নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বুলবুলির এই পেছনের দিকের লাল
শটিতে এমন একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি আছে, দেখামাত্রই মনের ভেতর চেপে বসে যায়।

বইপত্রে পড়ে আসছি বুলবুলি গানের পাখি। কারো গলার আওয়াজ মিঠে এবং সুরেলা হলেই অন্য সবাই বলে থাকে বুলবুলের মতো মিষ্টি স্বর। শুনে আসছি ইরান দেশ গান, গোলাপ এবং বুলবুলির দেশ। কোনো কবি কোনো গায়ক কিংবা গায়িকা এমনকি মিলাদ পড়ানোর মওলানাকেও সমাজে বুলবুল পরিচয় লাভ করতে দেখা যায়। কিন্তু বুলবুলির গানটি কেমন? আমি নিজে জানিনে। ছোটবেলায় বুলবুলির বাসা ভেঙে বাচ্চা লুট করেছি, কিন্তু কণ্ঠের স্বরটি কেমন কান পেতে শোনার অবকাশ হয়নি। অনেককেই জিগগেস করেছি, বুলবুলির আওয়াজটি কেমন? কেউ বলতে পারেনি। অথচ সকলে একমত বুলবুলি গানের পাখি। এখানেই বইয়ে পড়া ধারণা ও শোনা কথার সঙ্গে আসল জিনিসের ফারাক।

এইবার প্রথম বুলবুলির গান শুনলাম। বুলবুলি একনাগাড়ে অধিকক্ষণ গান করে না। খাবারে ঠোকর দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে তার ঠোঁট থেকে এমন এক-একটা স্বর ঝরে পড়ে সেটাকে পাহাড়ি ঝরনা বয়ে যাওয়ার সময় পানির প্রবাহের সঙ্গে তলার পাথরের ঘষা লেগে যে নরম ভেজা শব্দখণ্ড সৃষ্টি হয়, একমাত্র তার সঙ্গে তুলনা চলে। বুলবুলির ঠোঁট থেকে আরো কিছু খণ্ডখণ্ড শব্দ বেরিয়ে আসে, হারমোনিয়ামের কোমল ঋষভ এবং কোমল গান্ধারের সঙ্গে সেগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যেতেও পারে। এটা আমার কষ্টকল্পনামাত্র। বুলবুলির স্বর বুলবুলিরই মতো।

আমি পাখিপুত্রটির কাছে অনেক ঋণে ঋণী। সে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করেছে। পাখির কণ্ঠের বৈচিত্র্য শুনে অনুভব করতে পারি, এখনো মানুষের ভাষা কতদূর সীমিত। কতকিছুই আমি জানতাম না। আমার জানালার পাশের আমগাছটিতে যে দশ-বারোটি বুলবুলি স্থায়ীভাবে বাসা করে থাকে, তার কিছুই আমি জানতাম না। এখন সকালবেলা দরোজা খুললেই দেখি আমার ডাইনে বাঁয়ের বাড়িগুলোর দেয়ালে, গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি ছুটোছুটি করছে। এতকাল চোখ বন্ধ করে ছিলাম কেমন করে।

একদিন যখন বিকেলের তেজ মরে এসেছে, খুবই অনায়াস ভঙ্গিতে উত্তরদিক থেকে একটা দোয়েল উড়ে এল। তার শাদা কালো পাখায় রোদের ঝলক লেগে ঝকঝক করছে। পাখিটি উড়ে এসে পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেয়া চাল খুঁটে খেতে লাগল। দানা খাওয়ার ভঙ্গি করে লাফিয়ে লাফিয়ে গোটা ছাদটাই জরিপ করে ফেলল। তারপর একলাফে গিয়ে দেয়ালের ওপর বসে শিস দিতে থাকল। এমন কোমল স্বর ঘনায়মান সন্ধের ফিকে ফিকে অন্ধকারের ভেতর এমন একটা জাদু রচনা করে, তার স্পর্শে সমস্ত বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। এই পাখিটিই বোধ করি পাশের দালানের শিকের ওপর বসে থেকে মসজিদের আজান হওয়ার পূর্বে, মোরগ ডাকার অনেক আগে থেকে লম্বা লম্বা শিস দিয়ে প্রভাতের ঘুম ভাঙানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওপাশের জলপাই গাছে বসে যে দোয়েলটি শিস দেয় ওটি বোধ হয় তার জোড়া। এদিকে ওদিকে, নিকটে দূরে এত দোয়েল ডাকতে থাকে কোনটা কার জোড়া কে বলতে পারে। যে মনোযোগ দিয়ে রাত্রিশেষের দোয়েলের শিস তন্ময় হয়ে শোনে একমাত্র তারই মনে হবে, দোয়েলেরা কণ্ঠস্বরের রসায়ন গাঢ় জমাটবাঁধা আঁধারকে ফিকে করে আনছে। রাত্রিশেষে দোয়েল যে শিস দেয়, সকালবেলা সেই শিস দেয় না। স্বরতরঙ্গের ওঠানামার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে

যায়। দুপুরবেলা দোয়েল অন্যরকম শিস দেয়। সাঁঝ নামার আগে দোয়েলের কণ্ঠ থেকে অমৃত নির্ঝর বয়ে যায়।

গাঙশালিকেরা ঝাঁক বেঁধে আমার বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। এগাছ থেকে ওগাছে যায়। কখনো নিচে নেমে এসে চরতে থাকে। মনুষ্যমল ভক্ষণকারী এই জাতটির প্রতি আমার মনোভাব কোনোকালেই অনুকূল ছিল না। ছোটবেলাতে বাসা থেকে এই প্রজাতির শালিকের একটি বাচ্চা আমি চুরি করেছিলাম। এই নোংরা বাচ্চা হাতে ধরেছি বলে আমার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরেও শীতের সন্ধেয় পুকুরে গোসল করিয়ে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলেন। সেই বালকবয়সের সংস্কারটা মনে মনে এমনভাবে জেঁকে বসেছে কিছুতেই পাখিটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। মনে হত পাখিটির শরীরে একটা অপবিত্র ভাব জড়িয়ে রয়েছে।

আমার ধারণা গাঙশালিকেরাও আমার এই মনোভাবের কথা জানে। তারা এধারে ওধারে উড়ে বেড়ায়, অমার ছাদে একবারও আসে না। কিন্তু আমার ছাদে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে, সকাল দুপুর সন্ধে এত পাখির মেলা বসছে, এত খাওয়াদাওয়া চলছে, গাঙশালিক পাখি হয়ে এই এত বড় ব্যাপারটির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কি পারে? একদিন একঝাঁক গাঙশালিক আমার জানালার ধারের আমগাছটিতে বসে তাদের ভাষায় একটা গানের আসর বসাল। আর ওই সময়ের মধ্যে আমি নানা ধরনের পাখির গানের একজন ভালো সমঝদার হয়ে উঠেছি। তাদের স্বরতরঙ্গের ওঠানামা, স্বরের কম্পন, বিরতি, ফাঁক এগুলো এত ভালোভাবে বুঝতে পারি, আমার যদি বয়স অন্তত পনেরো বছর কম থাকত পাখির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে আমি নতুন ধরনের সংগীতকলা সৃষ্টির কাজে লেগে যেতাম। আমার ভীষণ অনুশোচনা হল, যে-পাখি এত সুন্দর গান করে তাকে আমি এতকাল অপবিত্র মনে করে আসছি। মুরগিও মনুষ্যমল ভক্ষণ করে। আমি তো আদর করে মুরগির মাংস খেয়ে থাকি। আর গাঙশালিকের বেলায়? আমার মনে একটা অপরাধবোধ ঘনিয়ে এল। মাফ চাইতে ইচ্ছে হল। পাখির কাছে মাফ চাইলে কি পাখি বুঝবে? অতএব নিজের কাছে মাফ চাইতে হল। আমার এই মনোভাব পরিবর্তনের সংবাদ অন্তত একটা গাঙশালিক অনুমান করতে পেরেছিল।

একদিন দুপুরবেলা দেখতে পেলাম একটা গাঙশালিক উড়ে এসে আমার দেয়ালে বসল। তার শরীর শাদা কালো পালকে ঢাকা। গলার তুলনায় মাথার দিকটা একটু মোটা। কিন্তু চোখ দুটো? এত ভাসাভাসা, এত টলোটলো, এত সুন্দর, সবটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ঠোঁট দুটো অন্য প্রজাতির শালিকের তুলনায় একটু চ্যাপটা। ঠোঁট চোখ মাথা সবটা মিলিয়ে এমন একটা আবহ, উদাসনয়না এমন এক সুন্দরী নারীর কথা মনে করিয়ে দেয়, যে-নারী শাড়ির আঁচলটা মাথার একটুখানি পেছনে সরিয়ে নিয়েছে। পাখিটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর গলাটা ফুলিয়ে গান করতে থাকল। এই সময়ে আমার পাখিপুত্রটি তার বউ নিয়ে হাজির হল। অমনি গাঙশালিকটা লম্বা উড়াল দিয়ে চলে গেল। অপরাধ হয়তো সবটা আমার নয়। পাখিপুত্রটির সঙ্গেও তার কোনো বিরোধ থাকতে পারে। একদিন সন্ধেবেলা সূর্য ডোবার ক্ষণটিতে, আকাশ পৃথিবী যখন নির্জন হয়ে আসে, গোধূলি রেখা জাগি জাগি করে, ঠিক সেই সময়ে একটি হলদে পাখি জানালার পাশের আমগাছের সবচাইতে উঁচু ডালটিতে এসে বসল। এই

ধরনের পাখিকে কুটুম ডাকা পাখিও বলা হয়। পাখিটি যেভাবে উড়ে এসে গাছের উঁচু ডালটিতে সহজভাবে বসল, সেই বসার ভঙ্গিটিই আমাকে মুগ্ধ করে ফেলল। এই নির্জন শান্ত স্নিগ্ধ অগ্রসন্ধের ক্ষণটিতে পাখিটির পাখিত্ব এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠল, আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। তার গায়ের রং এত হলুদ পৃথিবীর কোনো হলুদের সঙ্গে তার তুলনা করা যাবে না। পাখার নিচের দুটি পালক গাঢ় কালো রঙে ছোপানো। এই কালো রংটাই পাখির শরীরের হলদে রঙের দীপ্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠোঁটের ওপরের দিকটাও একেবারে গহিন কালো। সব মিলিয়ে পাখিটার শরীর থেকে এমন পবিত্র সৌন্দর্য ঝরে পড়ছে, কোনো পাজি মানুষ যদি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অতীত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে তার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করবে।

এই হলুদ পাখিটা যেমন আচমকা এসে গাছের আগার ডালটিতে বসেছিল, তেমনি আচমকা কী একটা শব্দ উচ্চারণ করে আকাশে একটি হলুদ রেখা এঁকে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল। আমার মনে রেখে গেল তার রেশটি। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা শীতল ঢেউ ভাঙতে লাগল। সিরাজুল ইসলাম একটি গান লিখেছিলেন, তার প্রথম কলিটি মনে পড়তে থাকল—

হলদিয়া পাখি সোনার বরন
পাখিটি ছাড়িলে কে রে, ছাড়িল কে?

আমার মনের ভেতর প্রতিধ্বনি জাগল পাখিটি ছাড়িল কে রে ছাড়িল কে? কে? কে?

চড়াইগুলো এসেছিল গেল বছরের শুরুর দিকে। সেই যে তুলসী গাছের খয়েরি ফল খেতে এসেছিল আর যায়নি। এই এক আঙুলের সমান লম্বা অতি ক্ষুদ্র পাখিগুলো কী পরিমাণ নচ্ছার এবং বেতমিজ সে আমি বলে শেষ করতে পারব না। তাদের বিরুদ্ধে আমার প্রথম নালিশ তারা পাখির জাত এবং মনুষ্যজাতের মধ্যবর্তী সীমানা মানে না। তুলসীর ফল খাওয়া যখন শেষ হল, তাদের চলে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তারা যায়নি। কী স্পর্ধা এবং সাহস তারা আমার থাকার ঘরে হানা দিতে আরম্ভ করেছে। আমি যেখানটিতে বসে লিখি তার পেছনে জানালার ওপরের তাকে রবি ঠাকুরের একটা ছবি হেলিয়ে রেখেছি। জোরে বাতাস বইলে ছবিটা ঝরে পড়ে। রবি ঠাকুরের ছবির প্রাণও আসল রবি ঠাকুরের মতো। ঝড়ঝাপটার আঘাত সয়েও টিকে যায়। আমাকে আবার উঠিয়ে রাখতে হয়। রবি ঠাকুর এমন মাল তাড়াতে চাইলেও কি তাড়ানো যায়?

একদিন দেখলাম দুটো চড়াই রাজ্যের খড়কুটো এনে রবি ঠাকুরের ছবির পেছনে জড়ো করছে। চড়াই দুটোর বদমায়েশি বুদ্ধি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। এই নচ্ছার পাখি দুটো ধরে নিয়েছে রবি ঠাকুরের ছবির পেছনে বাসা তৈরি করলে বাংলা সাহিত্যের খাতিরে আমি কিছু বলব না, চুপচাপ দৃশ্য দেখে যেতে থাকব। অপোগণ্ড রবীন্দ্র-পোষ্যেরা কুকর্ম করে যেভাবে পার পেয়ে যায়, এই চড়াই দুটোও সেভাবে আমাকে বোকা বানাবে। একদিন ইদ্রিসকে ডেকে বললাম, ওই বুড়োর ছবির পেছনের খড়কুটো সব বাইরে ফেলে দাও। ইদ্রিস বলল, একখান কথা জিগাইবার খুব মন লয়। আমি বললাম, জিগাইয়া ফেলাও। সে বলল, এই বুড়া মানুষটার মুখ তো এক্কেরে দাড়ি মোচে ঢাকা। আমি চিন্তা করি হে ভাত কুন দিক দিয়া খায়। আমি বললাম, ভাত খাওয়ার কথা

পরে, তুমি আগে খড়কুটো সব বের করে দাও। ইদ্রিস শরীরখানি আঁকিয়েবাঁকিয়ে বলল, হে আমি পারতাম না। আমার ঘরে বউয়ের পেডেত বাচ্চা। সে-যাত্রা চড়াইয়ের বাসা রক্ষা পেয়ে গেল। একদিন আমি অবাক হয়ে দেখি চড়াই এবং চড়াইনি রবি ঠাকুরের ছবির ওপর বসে মনের সুখে যৌনসঙ্গম করছে। আমি ভাবলাম, আমার আর করার কিছু নেই। রবি ঠাকুর তো আবার গুরুদেব। তিনি চড়াই এবং চড়াইনির যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। চড়াইদের অপকর্মের বিচারের ভার রবি ঠাকুরের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি রাজশাহী চলে গেলাম। ওখানে আমি দশদিনের মতো কাটিয়েছিলাম। যেদিন রাজশাহী থেকে ফিরে এলাম, সেদিন আকাশে হাওয়া এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত চলছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে কোনোরকমে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠে দেখি দরোজায় তালা দেয়া। আমার মাথায় একেবারে খুন চেপে গেল। এতদূর থেকে এত ঝড়বিষ্টি মাথায় করে ফিরলাম, বাসায় কেউ নেই। না ইদ্রিস, না সুশীল, না আনোয়ার। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললাম। ঘরে ঢুকে দেখি সমস্ত কার্পেট ভিজে চুপসে গেছে। বাতাসের তোড়ে টেবিল থেকে কাগজপত্র উড়ে উড়ে পানির মধ্যে পরমগতি লাভ করেছে। রবি ঠাকুরের ছবিটিও দেখলাম পানিতে খাবি খাচ্ছে। একটু দূরে চড়াইদের বাসাটি মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। চড়াই এবং চড়াইনি বাসার ওপর বসে আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। ঠিক করে ফেললাম, আজ রবি ঠাকুরের ছবি এবং চড়াইয়ের বাসা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। থিকথিকে ময়লা নোংরা পাখির বাসায় আমার হাত দিতে ঘেন্না হচ্ছিল। ভাবলাম ইদ্রিস আসুক। আমি ভেতরে জামাকাপড় ছাড়তে গেলাম। এরই মধ্যে ইদ্রিস এল। তার পেছন পেছন সুশীল এবং আনোয়ার। সাবালক ছেলেদের সামনে কাঁচা রাগ দেখাতে নেই। ইদ্রিসকেই চেঁচিয়ে জিগগেস করলাম, কই গিয়েছিলে? ইদ্রিস বলল, নিচে। নিচে করছিলে কী? ইদ্রিস একবার সুশীল একবার আনোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভি সি পিতে বই দেখতে গিয়েছিল। এদিকে বিষ্টির পানিতে কী দশা করেছে একবারও ওপরে এসে খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করনি? ইদ্রিস বলল, ফাইটিঙের ছবি, বিষ্টি কহন আইল ঠিক পাই নাই। আমি বললাম, জানালা বন্ধ করে যাওনি কেন। সে বলল, আমরা গেছি সাড়ে তিনটার সময়। তহন আসমানে চচইরা রইদ। ইদ্রিসের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আমি কোনোদিন জিততে পারিনি। আমি তাকে পাখির বাসাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, ওটা ফেলে দিয়ে এসো। ইদ্রিস আমার মুখের ওপর বলে দিল, অন্য কামের কথা কন। আমার ঘরে বউয়ের পেডত বাচ্চা। আমি পাখির বাসা ফেলতে পারতাম না। বাসার ভিতর পাখির আণ্ডাবাচ্চা আছে। আমি ঝুঁকে পড়ে বাসাটি উঠিয়ে নিয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি একদলা জীবন্ত ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড নড়ে নড়ে উঠছে। সুশীলকে বললাম, তুমি ফেলে দিয়ে এসো। সুশীল বলল, এইবার পাখির বাচ্চাগুলো বড় হয়ে উড়ে যাক, তারপর বাসাটি আমি নিজেই ভেঙে দেব। তারপরে কত জোড়া আণ্ডা হল, কত জোড়া চড়াই উড়ল। এখনো বাসাটি রবি ঠাকুরের ছবির পেছনে আছে। এখন চড়াইয়ের সংখ্যা বারো ছাড়িয়ে গেছে। রবি ঠাকুরের মাথার ওপর বসে অপকর্ম করার দরুন রবি ঠাকুর কোনো শাস্তি দেননি। চড়াইরা ওটাকেই যত্রতত্র রমণকর্ম করার ছাড়পত্র বলে ধরে

নিয়েছে। আমাকে তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। আমি যখন একমনে লিখি ঘাড়ের ওপর এসে বসে। আমার পাশে যে বাটিতে চাল থাকে সেখান থেকে চাল খেয়ে চলে যায়। টেবিলে ভাত বেড়ে রাখলে মুখ দিয়ে বসে। পুরুষ চড়াই যেগুলোর গলার নিচে হারের মতো কালো দাগ আছে, সেগুলোই হল আসল হারামি। সূর্য ওঠার পর থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত নিরন্তর যৌনসঙ্গম করে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। আমি কি মেরে কেটে এই চড়াইদের তাড়িয়ে দিতে পারতাম না। অবশ্যই পারতাম। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে আমাকে নিবৃত্ত থাকতে হয়েছে। এই চড়াই হারামিরাও পাখিসমাজের পর্যায়ভুক্ত। পাখিদের একটি প্রজাতির ওপর যদি নির্যাতন করি, বৃহত্তর পাখিসমাজ সেটা মেনে নেবে না। পাখিসমাজে আমার দুর্নাম রটে যাবে এবং আমার পাখিপুত্রটি সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। তাকে আমার এখানে আসা বাদ দিতে হবে।

বলেছিলাম, কাকের বিষয়ে সব কথা বলা হয়নি। কাকদের আমি ডাকিনি। আমার পাখিপুত্রটিকে কাকসমাজ সুনজরেও দেখেনি। তবু কাকেরা যে প্রতিদিন আমার বরাদ্দ চারটে রুটি থেকে দুটো আদায় করে নিচ্ছে, তার পেছনের কারণ তাদের দাবি। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—কাক চেষ্টায় বক ধ্যানং। কাকের মতো চেষ্টা করতে হবে, বকের মতো ধ্যান করতে হবে। স্বল্পাহার, স্বল্প নিদ্রা এবং গৃহত্যাগ বিদ্যার্থীর এই পাঁচটিই লক্ষণ। শিশুপাঠ্য বইতে আছে না, "একদা একটা কাক খুব পিপাসার্ত হইয়াছিল। সব জায়গায় খুঁজিয়া, কোথাও জলের সন্ধান পাইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত পিপাসার্ত কাক একটি কলসির সন্ধান পাইল। কলসি দেখিয়া কাকের মনে খুব আনন্দ হইল। সে ভাবিয়াছিল প্রাণ ভরিয়া কলসির জল পান করিয়া পিপাসা মিটাইবে। কিন্তু নিকটে আসিয়া কলসির ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া কাকটি হতাশ হইয়া পড়িল। কলসির তলায় অল্প জল রহিয়াছে, কিন্তু কাকের সেই জল পান করিবার কোনো উপায় নাই। কাকটি আপন মন্দভাগ্য মানিয়া না লইয়া চিন্তা করিয়া একটা উপায় বাহির করিল। সে একটা একটা নুড়িপাথর আনিয়া কলসির তলায় ফেলিতে লাগিল। একসময়ে নুড়িপাথরে সমস্ত কলসিটা ভরিয়া গেল এবং তলার জল উপরে উঠিয়া আসিল। মনের সুখে জল পান করিয়া কাক আপন পিপাসা নিবারণ করিল। বৎসগণ এই গল্পের শিক্ষা এই, যে-কোনো কাজ কঠিন মনে হইলে হতাশ হইয়া হাত বুকে দিয়া বসিয়া থাকিবে না। ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি খাটাইয়া একটা উপায় বাহির করিতে চেষ্টা করিবে। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব এই কারণে যে সে সব সময় অন্যবিধ প্রাণীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীর কাছ হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।" পাঠশালার গল্পের উদ্যমী কাক যেভাবে নুড়ি ফেলে কলসির তলার পানি ওপরে তুলে পিপাসা নিবারণ করেছিল, আমার কাছ থেকে বরাদ্দ আদায় করার ব্যাপারেও কাকদের অনেকটা সে ধরনের সম্মিলিত চেষ্টা করতে হয়েছে।

আমি যখন হাতে রুটি নিয়ে ছাদে এসে কাকমণ্ডলী শব্দটি উচ্চারণ করতাম, শব্দটা মন্ত্রের কাজ করত। দলে দলে কাক ছুটে এসে দেয়ালে, ছাদে, নারকোল গাছের হেলানো শাখায় বসত। টুকরো করে রুটি যখন ছুড়ে দিতাম কাকেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোঁটে

ধরত। পাড়াপড়শি সকলে ঘুমভাঙা দৃষ্টির বিস্ময় নিয়ে কাকের রুটি খাওয়া দেখত। আমার কাছে ছিল এটা একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার। কিন্তু মানুষ প্রতিদিনই আগ্রহসহকারে রুটি খাওয়ার উৎসবটি দেখত। দুটিমাত্র রুটি আর কাক অতগুলো। সকলের ভাগে পড়ার কথা নয়। বঞ্চিত কাকেরা দেয়ালে ঠোঁট ঘষে প্রতিবাদ জানাত, গতরাতের বাসি ভাত থাকলে ছড়িয়ে দিতাম। না থাকলে ঘণ্টা বাজিয়ে দিতাম। এটা ফাইনাল ওয়ার্নিং, সুতরাং কাকদের চলে যেতে হত।

আমার খোঁড়া কাকটিও আসত। বেচারি লাফিয়ে খাবার ধরতে পারত না। তার ভাগে যাতে কিছু পড়ে সেজন্য আমাকে আলাদা ব্যবস্থা নিতে হত। কাকদের সমাজবোধ এবং সহমর্মিতার ভাবটি প্রবল, কিন্তু দুর্বলদের ঠকিয়ে খেতেও দেখি কাকদের কোনো জুড়ি নেই। এই সময়েই কাকদের কতিপয় মহৎ গুণের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। পুরুষ কাকটি নিজের মুখের খাবার বান্ধবীর মুখে তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মা-কাক নিজে না খেয়েও বাচ্চাকাকের মুখে নিজের আহার তুলে দেয়। এই সময়ে আমার মজার একটি অভিজ্ঞতা হয়। একদিন দেখলাম আমার খোঁড়া কাকটি হাজির নেই। আমি অন্য কাকদের জিগগেস করলাম, খোঁড়া কই? খোঁড়া শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সবগুলো কাক একসঙ্গে উড়ে চলে গেল। তার পরদিন কাকেরা যখন খেতে এল, একই কথা জিগগেস করলাম, অমনিই সব কাক উড়ে চলে গেল। এই খোঁড়া শব্দের সঙ্গে কাকদের চলে যাওয়ার মধ্যে এমন কী সম্পর্ক? খোঁড়া শব্দটির কোনো ভাষাতাত্ত্বিক কেরামতি আছে কি না আমার এক ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধুর কাছে জেনে নেয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আছে। এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বন্ধুটি বদরাগী এবং বদমেজাজি। তিনি মনে করতে পারেন আমি তাঁকে ঠিসারা করছি।

একদিন রুটিহাতে বেরিয়ে এসেছি এবং কাকমণ্ডলী শব্দটিও উচ্চারণ করে ফেলেছি। কাকেরা দলে দলে খেতে এল। আমি ছাদের ওপর তাকিয়ে দেখি, একটি দাঁড়কাক বসে আছে। আহা বড় ভালো লাগল। শহরে কখনো দাঁড়কাক দেখেছি মনে পড়ে না। গ্রামের মানুষ শহরে এলে যেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে কাকটিও তেমনি এক কোনায় জবুথবু হয়ে বসে আছে। আমি তার দিকে রুটির টুকরো ছুড়ে দিলাম। শহরের কাকেরা সে টুকরোগুলো তার মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলল। আমার মনে বড় লাগল। এভাবেই শহরের মানুষেরা গ্রামের মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে থাকে। তার পরদিন একটার জায়গায় দুটো দাঁড়কাক এল। তার পর থেকে এখানে সেখানে নানা জায়গায় দাঁড়কাক দেখতে লাগলাম। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। গ্রামে কী ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, নইলে শহরে দলে দলে দাঁড়কাক এমনভাবে ছুটে আসবে কেন? নদীভাঙা মানুষ যেমন আসে, দুর্ভিক্ষের থাবা থেকে জান বাঁচানোর জন্য হাভাতে মানুষ যেমন আসে, তেমনি শহরে দলে দলে দাঁড়কাক আসছে, তার কারণ কী?

একদিন কাকমণ্ডলী করে ডাক দিয়েছি, তারা খেতেও এসেছে। দুটো রুটির মধ্যে একটা শেষ করেছি এরই মধ্যে দেখি সব কাক একযোগে কা কা করে আমার ছাদের সীমা পেরিয়ে আকাশে উড়ে উড়ে কোলাহল করতে লাগল। এত কাক নানা জায়গা থেকে এসে জুটেছে যে আমার সামনের আকাশটা যেন একটা কাকের সমুদ্র হয়ে গিয়েছে। আমি এসে ইদ্রিসের সঙ্গে ঝগড়া লাগালাম। বললাম সে খারাপ নিয়ত করে

রুটি বানিয়েছে বলেই কাকেরা রুটি না খেয়ে চলে যাচ্ছে। ইদ্রিস আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে বলল, নিয়ত কী জিনিস বুঝি না। অন্যদিনের মতো আইজও রুটি বানাইয়া দিচ্ছি, কাকে খায় না ক্যান আমি ক্যামনে কমু।

তার পরের দিনও রুটিহাতে ছাদে গিয়ে কাকমণ্ডলী বলে ডাক দিলাম। কাকদের কোনো সাড়শব্দ নেই। তিন-চারবার ডাকার পর অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তিনটি কাক এল। তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসল না। ছাদ থেকে দেয়ালে যাচ্ছে, দেয়াল থেকে ছাদে। তাদের সুস্থিরতা একদম নেই। দু-তিনবার রুটির টুকরো মুখে তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল। তার পরদিনও এরকম কাণ্ড ঘটল। আমার সমস্ত রাগ পড়ল গিয়ে ইদ্রিসের ওপর। নিশ্চয়ই ব্যাটা রুটির মধ্যে কোনো একটা ভেজাল দেয়, সেজন্য কাক আর রুটি খেতে আসছে না। আমি পাখিবিশারদ সলিম আলির একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কাকেরা অসাধু উপায়ে উপার্জিত মানুষের দেয়া খাবার গ্রহণ করে না। উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, এক হিন্দু ভদ্রলোক মারা যাওয়ায় তাঁর পুত্রেরা শ্রাদ্ধের পিণ্ডি দিতে গিয়ে দেখে যে কাকেরা খাদ্য গ্রহণ করতে আসছে না। তখন তাদের স্বর্গগত পিতার আত্মার সদ্গতি হবে কি না ও নিয়ে খুব আশঙ্কা এবং সংশয় দেখা দিল। পুত্র-কন্যাদের মুখে তো রা নেই। তাদের বাবার পিণ্ড কাক গ্রহণ করছে না, তার সঙ্গে সামাজিক মানমর্যাদার প্রশ্নটিও তো জড়িত। এক বুড়ো মানুষ পরামর্শ দিলেন, তোমাদের বাবা কারো ঋণ শোধ না করে মরেছে কি না খোঁজখবর করে দেখো। অনেক খোঁজ খবর করার পর দেখা গেল, মৃত ব্যক্তি এক লোকের পাওনা টাকা শোধ না করেই মরেছে। সে লোকের টাকা শোধ করার পর পিণ্ডদান করা হল, দেখা গেল দলে দলে কাক খেতে এসেছে। ওগুলো তো গল্প, কিন্তু মনে তো একটা প্রভাব পড়ে। আমি কার টাকা মারলাম যে কাকেরা আমার দেয়া খাবার প্রত্যাখ্যান করবে।

তার পরদিন সুশীল এসে ভুলটা ভাঙাল। সে বলল, কাক কেন আসে না জানেন? আমি বললাম, ওই ইদ্রিস ব্যাটার দোষে। সে রুটি বানাবার সময় কামনা করে কাকেরা যেন এই রুটি না খায়। সুশীল বলল, সেসব কিছু নয়। আপনি সামনের দিকে চেয়ে দেখুন। দাঁড়কাকেরা পাঁতিকাকদের কীভাবে মেরে মেরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, আট দশটা দাঁড়কাক একজোট হয়ে যেখানেই পাঁতিকাক দেখছে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরদিন থেকে দেখতে থাকলাম দাঁড়কাকেরা দলবেঁধে জঙ্গি বিমানের মতো বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই পাঁতিকাক দেখছে হামলা করছে। কাকের জগতেও হিংস্রতা এবং মস্তানি প্রবেশ করেছে। একসময় হয়তো এমনও হতে পারে দাঁড়কাকেরা এই শহর থেকে পাঁতিকাকদের তাড়িয়ে দেবে। এখন কথা হল কাকের রাজ্যে বিপর্যয়ের যে লক্ষণগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, অন্যেরা কি সেভাবে দেখছে?

মাটির মানুষের জগতে হিংস্রতা এবং হানাহানি দেখে আকাশের পাখির জগতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানেও হিংস্রতা এবং জাতিবৈরিতার প্রকোপ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং মানুষের মতো কর্তব্য পালন করার জন্য আমার মানুষের কাছে ফিরে না গিয়ে উপায় কী? আমি বৃক্ষ নই, পাখি নই, মানুষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, আনন্দের হোক, বেদনার হোক আমাকে মানুষের মতো মানুষের সমাজে মনুষ্যজীবনই যাপন

করতে হবে। মনুষ্যলীলার করুণ রঙ্গভূমিতে আমাকে নেমে আসতে হবে। তথাপি আমার জীবন আমি একেবারে অর্থহীন মনে করিনে। আমার প্রাণে পুষ্পের আঘ্রাণ লেগেছে, জীবনের একেবারে মধ্যবিন্দুতে বৃক্ষজীবনের চলা অচলার ছন্দদোলা গভীরভাবে বেজেছে, বিহঙ্গজীবনের গতিমান স্পন্দন বারংবার আমার চিন্তাচেতনাকে অসীমের অভিমুখে ধাবমান করেছে। এই পুষ্প, এই বৃক্ষ, তরুলতা, এই বিহঙ্গ আমার জীবন এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, আমার মধ্যে কোনো একাকিত্ব, কোনো বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারিনে। সকলে আমার মধ্যে আছে, আমি সকলের মধ্যে রয়েছি। আমি পুত্রটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমার পাখিপুত্রটি আমাকে যা শিখিয়েছে কোনো মহৎ গ্রন্থ, কোনো তত্ত্বকথা, কোনো গুরু-বাণী আমাকে সে শিক্ষা দিতে পারেনি। একমাত্র অন্যকে মুক্ত করেই মানুষ নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে। আমার পাখিপুত্র মুক্ত, আমি মুক্ত, আমাদের সম্পর্ক থেকে প্রত্যহ অমৃত উৎপন্ন হয়। এই আকাশের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কি অমৃতসমুদ্রে অবগাহনে নয়?